রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা

ডঃ জিয়াউর রহমান আজমী

রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ডঃ জিয়াউর রহমান আযমী

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

শপ্রঃ ০৭

রসূলুল্লাহর বিচার ব্যবস্থা
ডঃ জিয়াউর রহমান আযমী
অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

প্রকাশনায়
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ বড় মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট
ঢাকা ১২১৭, ফোনঃ ৮৩ ১২ ৯২

শব্দ বিন্যাস
শরীফ মাহবুবুল হক
মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ ১৯৯৮

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
মূল্যঃ২৬.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী

Rasulullahr Bichar Bebosta : By Dr. Ziaur Rahman Azami, Translated by Abdus Shaheed Naseem. Published by Shatabdi Prokashoni; Sponsored by Sayyed Abul A`la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar, Wireless Railgate, Dhaka- 1217. 1st Edition March 1998, Right Translator.
Price Tk. 26.00 Only.

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে দু'টি কথা

গ্রন্থকার ডক্টর জিয়াউর রহমান আযমীর জন্মভূমি ভারত। উত্তর প্রদেশের আযমগড়ে ১৯৪৩ ইসায়ি সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এক উঁচু ও ধনাঢ্য হিন্দু পরিবারে। তাঁর পিতার বাণিজ্য বহর কোলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

১৯৫৯ সালে আযমগড় শিবলি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে মেট্রিক পাশ করেন। মেট্রিক পরিক্ষার পর একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পরিক্ষার ফল এখনো প্রকাশ হয়নি এ সময় তাঁর কোনো এক বন্ধু তাঁকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর 'একমাত্র ধর্ম্ম' পুস্তিকাটির হিন্দি সংস্করণ পড়তে দেয়। বইটি পড়ার সাথে সাথে তাঁর চিন্তার বিপ্লব ঘটে যায়। তিনি অনুভব করলেন এ বই তাঁকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছে। অতপর অল্প দিনের মধ্যেই তিনি মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে হিন্দি সংস্করণগুলো গোগ্রাসে পড়ে ফেলেন। কলেজের জনৈক শিক্ষকের একটি কুরআন ক্লাশেও তিনি যোগদান করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ১৯৬০ সালে তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এসব পরিক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তিনি ইসলামের জ্ঞানান্বেষণে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সাথে স্নাতক এবং উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রী লাভ করেন। অতপর মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী আইন শাস্ত্রে ডক্টরেট লাভ করেন। বর্তমানে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে দীনের খেদমত করে যাচ্ছেন।

তিনি আল আজহারে ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল ফারজ আততাবারীর (যিনি ইবনুতিল্লা নামে খ্যাত) বিখ্যাত গ্রন্থ "আকদিয়াতু রাসূলিল্লাহ্" গ্রন্থের উপর গবেষণা করেন। এটি হচ্ছে রসূলুল্লাহর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তাবলীর সংকলণ। খুবই বিখ্যাত গ্রন্থ এটি। তিনি এ গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং এতে টীকা টিপ্পনী সংযোজন করেন।

উক্ত গ্রন্থের সূচনাতে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন এবং তাতে ইসলামের বিচার বিভাগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেন। আমাদের হাতের এই পুস্তিকাটি তাঁর সেই ভূমিকারই মূল অংশ। সুন্নতে রসূলের আলোকে ইসলামের বিচার বিভাগ সম্পর্কে এতে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক ছবি আঁকা হয়েছে। এটি আমাদের গুণীজনদের কাজে আসবে বলে চিন্তা করে বাংলা ভাষায় উপস্থাপন করলাম। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এ বইয়ের ৭ ও ৮ অনুচ্ছেদ দু'টি আমরা আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর তাফীমুল কুরআন থেকে এখানে সংকলন করে দিয়েছি।

ইসলামী আদলের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুস্তিকাটি ক্ষুদ্র হলেও একটি ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করি। দয়াময় আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ঢাকা।

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. ইসলামে বিচার ফায়সালা

কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ

বিচার ফায়সালা বুঝানোর জন্যে আরবি ভাষায় قضاء শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'কাযা' মানে হুকুম বা নির্দেশ দানকরা, আইন বা অনুশাসন জারি করা এবং রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা। [قضاء-র ইংরেজি অনুবাদ Decree - অনুবাদক]। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ - (بنى اسرائيل : ٢٣)

তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন [ও আইন জারি করছেন], তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও দাসত্ব করবেনা। [বনি ইসরাঈল ঃ ২৩]

قضاء শব্দটি মূলত ছিলো قَضَایٌ। ی আলিফের পরে আসার কারণে হামযায় [ء] রূপান্তরিত হয়েছে। قضاء শব্দের বহু বচন হলো اَقْضِيَةٌ। قَضِيَّةٌ শব্দটিও অনুরূপ। এর বহু বচন قَضَایَا। قضاء এবং قَضِيَّةٌ এর একই অর্থ।

পারিভাষিক অর্থ

ইবনে রুশদ বলেছেন ঃ 'কোনো শরয়ী বিধানকে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ আকারে প্রকাশ করাকে কাযা বলা হয়।'

ইবনে আবেদীন আল্লামা কাসেমের সূত্রে বলেছেনঃ 'বৈষয়িক বিষয়ে সৃষ্ট বিবাদ সম্পর্কে কোনো ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় রায়কে 'কাযা' বলা হয়।'[১]

থানবি বলেছেনঃ 'কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষের সেই সিদ্ধান্তকে 'কাযা' বলা হয় যা কার্যকর করা অপরিহার্য।'

কেউ কেউ বলেছেন ঃ 'পারিভাষিক অর্থে মামলা মকদ্দমা ও ঝগড়া বিবাদের ফায়সালা ও মীমাংসা করার নাম 'কাযা'।'[২]

টীকা ঃ ১. হাসীয়া ইবনে আবেদীন ঃ ৫ম খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা

২. ইসতেলাহাতুল উলূমুল ইসলামিয়া ঃ ৫ম খন্ড ১২৩৫ পৃষ্ঠা

এই সংজ্ঞাগুলো থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, সমকালীন শাসক কর্তৃক বিচারকের রায়কে অবশ্য পালনীয় ঘোষণা দেয়া এবং তা কার্যকর করা 'কাযা'র অন্তর্ভুক্ত। 'কাযা' ফতোয়ার মতো নয়, যদিও উভয়টিই শরীয়ার বিধান প্রকাশ করে। যাকে ফতোয়া প্রদান করা হবে, তার জন্যে ফতোয়া বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য নয়। কিন্তু কাযা'র বাস্তবায়ণ অপরিহার্য।

তাশ্ কুবরা জাদা ফতোয়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ 'ফতোয়ায় সেইসব বিধানই উদ্ধৃত করা হয়, ফকীহ্‌গণ প্রাসংগিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেগুলো নির্গত করেছেন। এটা ফকীহ্‌গণের পরবর্তী লোকদের জন্য একটি সুবিধাও বটে। কারণ নিজেদের অক্ষমতার কারণে তারা প্রাসংগিক বিষয়ে বিধান নির্গত করতে সক্ষম হননা। তাই পূর্ববর্তীদের নির্গত বিধানের ভিত্তিতে ফতোয়া দানের সুবিধা ভোগ করেন।'[৩]

এই সংজ্ঞায় 'অপরিহার্য পালনীয়' কথাটি বলা হয়নি। একারণেই বিচারকের পজিশন মুফতির পজিশন থেকে অনেক সুরক্ষিত। কেননা, কেবল ফতোয়া দ্বারা কারো উপর কোনো নির্দেশ বা ফায়সালা কার্যকর করার অপরিহার্য দায়িত্ব বর্তায়না। মুফতি ফতোয়া প্রার্থীকে যে জবাব প্রদান করেন, সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারে।

পক্ষান্তরে বিচারকের রায় বা ফায়সালা কার্যকর করা অপরিহার্য। শরীয়ার বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে কাযি [বিচারক] এবং মুফতি একই কাজ করেন। তা সত্ত্বেও বিচারকের প্রদত্ত রায় কার্যকর করা অবধারিত, মুফতির ফতোয়া কার্যকর করা অবধারিত নয় তাই মুফতির পজিশন বিচারকের পজিশন থেকে অনেক নাজুক ও বিপজ্জনক। ইমাম ইবনে কাইয়্যেম তাঁর বিখ্যাত 'ইলামুল মু'কিয়ীন' গ্রন্থে এমত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামী মনীষীগণ বিচারাসনে বসে বিচারকের ফতোয়া প্রদানকে অপসন্দ করেছেন। কারণ এমনটি করলে সাধারণ মানুষ বিচারকের রায় এবং ফতোয়ার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেনা। একথাটি বর্ণিত হয়েছে কাযি শুরাইহ্‌র সূত্রে। একবার তাঁর কাছে কোনো এক ব্যক্তিকে আটক করার ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেছেন ঃ 'আমি রায় প্রদান করি, ফতোয়া দিইনা।'

---

৩. মিফতাহুস সাআদাত ঃ ২য় খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা

ইসলামে বিচার ফায়সালার গুরুত্ব

গোটা বিশ্বের বুকে কেবলমাত্র ইসলামই এমন একটি দীন যা ধর্ম ও জাগতিকতার সমন্বয়ে গঠিত। ইসলাম মানুষের সম্পর্ক একদিকে স্রষ্টার সাথে স্থাপন করে, আরেক দিকে জুড়ে দেয় সৃষ্টির সাথে। দীনের বিশ্বাসগত দিক থেকে একজন মুসলিমকে তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, আল্লাহ্র অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী এবং তকদীরের ভাল মন্দের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান পোষণ করতে হয়। অপরদিকে বিধানগত দিক থেকে দীন তাকে নির্দেশ দেয় সালাত কায়েম করতে, যাকাত পরিশোধ করতে, রমযান মাসের রোযা রাখতে এবং যাবার সামর্থ থাকলে আল্লাহর সম্মানিত ঘরে গিয়ে হজ্জ পালন করতে।

আবার জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়াদিতে আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করাকে তার জন্যে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে বিয়ে, তালাক, ব্যবসা বাণিজ্য, উত্তরাধিকার, হেবা, ওয়াকফ, অসীয়ত এবং ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অন্যসকল বিষয়ে।

এর অর্থ এই নয় যে, দীনি ও বৈষয়িক বিষয়াদির মর্যাদা এখানে পৃথক পৃথক। না, এমনটি মোটেও নয়। বরঞ্চ এগুলোর প্রত্যেকটিই একটি আরেকটির অংশ এবং অনুপূরক। বাহ্যত দীনি এবং বৈষয়িক বিষয়ে যে ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়, তাতো কেবল উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণের জন্যে। ফকীহগণ শরীয়ার বিধানসমূহকে যখন ইবাদত এবং মুয়ামিলাত [পারস্পারিক বিষয়াদি] বলে ভাগ করেন, তখন এতদোভয়ের মধ্যে তারা মূলত কোনো পার্থক্য করেননা। কেননা একজন মুসলিমের যেমন তার বিশ্বাসগত [ঈমানি] বিষয়সমূহের মধ্যে কোনোটিকে স্বীকার এবং কোনোটিকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই, ঠিক তেমনি বৈষয়িক বিষয়াদির ক্ষেত্রেও ইসলাম যেসব আইন বিধান ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে তার কোনোটি মানার আর কোনোটি না মানার অধিকার কোনো মুসলিমের নেই। এ ব্যাপারে আল কুরআনের অকাট্য ফায়সালা হলো ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا ۰ (الاحزاب :٣٦)

কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর

রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করবেন, তখন সে তার সে বিষয়ে নিজেই কোনো ফায়সালা করার স্বাধীনতা রাখবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা অমান্য করবে, সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে। [আল আহযাব ঃ ৩৬]

এভাবে ইসলাম বিশ্বাস ও পারস্পারিক বিষয়াদির মধ্যে এক সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপণ করে দিয়েছে। কোনো অবস্থাতেই এ সম্পর্ক ছিন্ন করা যেতে পারেনা। এ কারণেই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া- সাল্লামের উপর যেভাবে জনগণকে প্রশিক্ষিত ও পরিশুদ্ধ করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে অর্পিত হয়েছিল জনগণের পারস্পারিক সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন করার এবং তাদের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করার দাযিত্ব, যাতে করে কোনো শক্তিমান দুর্বলের উপর অবিচার করে তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে না পারে। এটা এ জন্যে অপরিহার্য, যেহেতু মানুষের নফ্সের মধ্যে লোভ লালসা এবং অন্যদের উপর বিজয়ী হওয়া ও চেপে বসার আবেগ আকাংখা বর্তমান রয়েছে। তাই একজনের দুস্কৃতি থেকে আরেকজনকে রক্ষা করার জন্যে বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য প্রয়োজন।

তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত এবং শিরককে খন্ডন করার পর কুরআন মজীদ যে বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে, তাহলো মানুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অত্যাচারী এবং শোষকদের শাস্তি দিয়ে মানুষের অধিকারকে সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে সত্য ও সুবিচারপূর্ণ ক্ষমতার কাছে অবনত করা। আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۔ (النساء : ٥٨)

আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন অবশ্যি সুবিচার করবে। [আননিসা ঃ ৫৮]

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবীগণকে পৃথিবীতে এজন্যে তাঁর খলীফা বানিয়ে পাঠিয়েছেন যেনো তারা তাঁর শরীয়া প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করে:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۔ (البقرة: ٣٠)

আর সেই সময়ের কথাও চিন্তা করে দেখো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাই। [আল বাকারাঃ ৩০]

বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে মৌলিক শর্তাবলী

বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে কাযি বা বিচারকের দায়িত্ব কেবল এতোটুকুই নয় যে, তিনি শুধু শরীয়তের হুকুম-বিধান বলে দেবেন এবং সেটাকে তার দাবি অনুযায়ী কার্যকর করবেন। বরঞ্চ তাঁর দায়িত্ব এর চাইতে আরো অনেক উচ্চতর ও ব্যাপকতর। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, যেসব সমস্যা তাঁর কাছে উপস্থাপিত হবে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলোর সমাধান কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হবেনা সেগুলোর ক্ষেত্রে তিনি কুরআন সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে প্রাসংগিক বিধান উদ্ভাবন করবেন। অর্থাৎ ইজতিহাদ করবেন। এই উদ্ভাবনের কাজটি তাকে করতে হবে দীনের সুস্পষ্ট বুঝ, পরিপূর্ণ আদর্শিক মানসিকতা এবং বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে। আর এই জিনিসটি তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান। একজন বিচারকের মধ্যে আল কিতাব, সুন্নতে রসূল, ইজমায়ে উম্মত এবং ফিকহি মতভেদ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হয়, ঐ দানটি হবে তার এর চাইতে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। একথার দলিল হলো, কুরআনে উল্লেখিত দুজন সম্মানিত নবী দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা। আল্লাহ জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুজনকেই সমমর্যাদা দান করেছিলেন। কিন্তু বুঝের ক্ষেত্রে সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দান করেছিলেন বিশেষত্বঃ

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ ۔ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ۔ (الانبياء : ٧٨-٧٩)

আর দাউদ এবং সুলাইমানের কথা স্মরণ করে দেখো, যখন তারা দুজনই একটি খামারের মকদ্দমায় রায় দান করছিল। খামারটিতে রাত্রি বেলা অন্য লোকদের ছাগল এসে ছড়িয়ে পড়েছিল।' আমরা তাদের বিচারকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। এ সময় আমরা সুলাইমানের মধ্যে সঠিক রায় প্রদানের বুঝ সৃষ্টি করে দিলাম। অথচ উভয়কেই আমরা হিকমাহ এবং জ্ঞান দান করেছি।
[আল আম্বিয়া ঃ ৭৮-৭৯]

বুঝের কারণেই একব্যক্তি ইউসুফ আলাইহিস সালামের জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় যে ইউসুফ সত্যবাদী এবং অপবাদ থেকে সম্পর্কহীন ঃ

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ج إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۔ فَلَمَّا رَأَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۔

(يوسف : ٢٦-٢٨)

ইউসুফ বললোঃ 'সে - ই আমাকে ফাঁসাতে চেয়েছিল'। মহিলাটির নিজ পরিবারেরই একজন মীমাংসাকারী রায় দিলো: ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে সে সত্যবাদিনী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। আর যদি জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে সে মিথ্যাবাদিনী এবং ইউসুফ সত্যবাদী। মহিলাটির স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছেড়াঁ, তখন সে বললো ঃ এটাতো তোমাদেরই [মেয়েলোকদের] ষড়যন্ত্র। আর তোমাদের ষড়যন্ত্র বড়ই সাংঘাতিক ধরনের হয়ে থাকে। [ইউসুফ ঃ ২৬-২৮]

আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) তাঁর বিখ্যাত একটি চিঠিতে এ বিষয়টির প্রতিই আবু মূসা আশয়ারীর (রা) দৃষ্টি আর্কষণ করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ তোমার সম্মুখে যখনই এমন কোনো মকদ্দমা আসবে, যার ফায়সালা কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ নেই, সে বিষয়ে তুমি অবশ্যি গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করবে এবং সঠিক বুঝ-এ উপনীত হবে।

হাফিয ইবনে কাইয়্যেম বলেছেন ঃ 'বান্দাহর প্রতি আল্লাহ্র যতো অনুগ্রহ ও দান আছে তম্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো, যথার্থ বুঝ এবং মহোত্তম জীবনোদ্দেশ্য। ইসলাম গ্রহণের পর এ দুটির চাইতে বড় কোনো দান কোনো মানুষ লাভ করতে পারেনা। এদুটি হলো ইসলামের সুদৃঢ় স্তম্ভ। এ স্তম্ভদ্বয়ের উপরই ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে।'[৪]

সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ ۔

৪.ইলামুল মুকিযীন ১ম খন্ড. ৮৭ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সঠিক বুঝ দান করেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) জন্যে দোয়া করেছিলেন এভাবে

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّاْوِيْلَ ٠ (صحيح البخارى)

হে আল্লাহ তুমি একে দীনের সঠিক বুঝ দান করো এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিখাও।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে তিনি আবদুল্লাহ্‌র (রা) জ্ঞান ও সঠিক বুঝ বৃদ্ধির জন্যে ও দোয়া করেছিলেন।

উমর বিন খাত্তাবকে (রা) আল্লাহ তা'আলা সঠিক বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন । তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেসব বিষয়ে ইজতিহাদ করতেন, যেসব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নতে রসূলে কোনো নির্দেশনা নেই। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তাঁর ইজতিহাদ সঠিক হতো। কদাচিৎই তাঁর ইজতিহাদ ভুল প্রমানিত হতো। এমনকি রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ ٠ (سنن ترمذى)

আল্লাহ তা'আলা উমরের যবানে সত্যকে বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।
তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (র) বলেছেন ঃ
আমি উমরের মুখ থেকে এমন একটি কথাও শুনিনি যে বিষয়ে
তিনি বলেছেন ঃ 'আমার মনে হয় বিষয়টি এরূপ', অতপর বিষয়টি সেরূপ প্রমাণিত হয়নি।'

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আমীরুল মুমিনীন আলী (রা)ও বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টি লাভের দিক থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন। বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে তাঁর মেধা ও অন্তর্দৃষ্টি কতো প্রখর ছিলো একটি ঘটনা থেকেই তা সহজে বুঝা যাবে। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন ঃ

একবার আমি নবী করীমের (স) কাছে বসাছিলাম। এসময় ইয়েমেন থেকে এক ব্যক্তি এসে বললেন ঃ ইয়েমেনের অধিবাসী তিনজন লোক আলী ইবনে আবী তালিবের কাছে তাদের মধ্যকার একটি বিবাদের মকদ্দমা দায়ের করেছে। তাদের আরজি হলো ঃ তারা তিনজনে একই তুহুরে এক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলা গর্ভবতী হয় এবং একটি ছেলে সন্তান প্রসব করে। এখন ছেলেটি কে পাবে? আলী রায় দিয়ে দু'জনকে সম্বোধন করে

বললেন ঃ ছেলেটি এই তৃতীয় ব্যক্তির। এতে সেই দু'জন রাগান্বিত হলো। অতপর তিনি অপর দু'জনকে সম্বোধন করে বললেন, ছেলেটি এই (তৃতীয়) ব্যক্তির । এতে সেই দ'জনও উত্তেজিত হলো। ফলে তিনি অপর দু'জনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ছেলেটি এই তৃতীয় ব্যক্তির । এতে সেই দুইজনও ক্রোধান্বিত হলো।

এবার আলী বললেন ঃ তোমরা ঝগড়াটে অংশীদার। আমি কোরা (লটারি) ফেলবো। যার নাম উঠবে সেই ছেলেটিকে পাবে। তবে সে অপর দুইজনকে দুই তৃতীয়াংশ দিয়্যত সমান মূল্য পরিশোধ করবে। অতপর তিনি তাদের তিনজনের নামে কোরা ফেলেন এবং যার নাম উঠে তাকে ছেলেটি দিয়ে দেন।

ঘটনাটি শুনে নবী করীম (স) হেসে দিলেন। হাঁসিতে তাঁর সম্মুখের দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল।

হাদীসটি আবু দাউদ তাঁর সুনানের 'তালাক' অধ্যায়ে এবং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানের 'কোরা' ফেলে ফায়সালা করা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ হাদীসটিকে মুরসাল হবার কারণে জয়ীফ বলেছেন। অবশ্য ইবনে হাযম এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সহীহ বুখারি ও মুসলিম বর্ণিত একটি হাদীস থেকে বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে সুলাইমান আলাইহিস সালামের সঠিক বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টির প্রমান পাওয়া যায়। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রা) । তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ

كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ احْدَاهُمَا . فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا انَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ . وَقَالَتِ الأُخْرَى انَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ . فَتَحَاكُمَا الَى دَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَقَالَ إِيْتُونِى بِالسِّكِّيْنَ اشُقُّه بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّهُ هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى . (بخارى مسلم)

দুজন মহিলার দুটি শিশু ছেলে ছিলো। একবার বাঘ এসে একটি মহিলার ছেলেকে নিয়ে যায়। সে অপর মহিলাটিকে বললো, বাঘ তো তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে! সে বললো: তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে! এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদ হলো। তারা দাউদ আলাইহিস সালামের কাছে বিচার প্রার্থী হলো। তিনি তাঁর রায়ে বড়জনকে ছেলেটি দিয়ে দিলেন। অতপর তারা তাঁর দরবার থেকে বেরিয়ে সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে গেলো। তাঁকে তারা সব ঘটনা বললো। তিনি বললেন, আমার জন্যে একটি ছুরি আনো। আমি ছেলেটিকে দ্বিখন্ডিত করে দুইজনকে দুইভাগ দেবো। এতে ছোট মহিলাটি চিৎকার করে উঠলোঃ এমনটি করবেননা, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। ছেলেটি ওর (ওকেই দিন)।' অতপর সুলাইমান ছোটজনকে ছেলেটি দিয়ে দিলেন।

এখন কেউ যদি আপত্তি তোলেন, সুলাইমান আলাইহিস সালামের পক্ষে তাঁর পিতার রায়ের বিপরীত রায় দেয়া বৈধ হয়েছি কি? তাহলে এর জবাবে বলবো, সুলাইমান আলাইহিস সালাম মূলত একটি বিচক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করেন। তিনি ছুরি আনতে বলে আসলেই ছেলেটিকে দ্বিখন্ডিত করতে চাননি। বরঞ্চ প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাঁর কথা শুনে ছোট মহিলাটির হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে। বাস্তবিকপক্ষে সন্তানের অকল্যাণ দেখলে কেবল মায়ের হৃদয়ই এভাবে কেঁদে উঠতে পারে। মহিলাটি ছেলের জীবন রক্ষার জন্যেই বলে উঠলো, ছেলেটি বড়জনের ওকেই দিয়ে দিন। বাস্ এক্ষণে সুলাইমান আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেলো। তিনি ছেলেটির সত্যিকার মাকে চিনে ফেললেন। মূলত বাস্তব সত্যে উপনীত হবার জন্যে এটা ছিলো তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত বুঝ ও অন্তরর্দৃষ্টি। হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি তাঁর বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফাতহুল বারিতে' এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন।

এই ঘটনাটি থেকে একথা পরিষ্কার হলো যে, কোনো মকদ্দমায় কেবল একটি পক্ষই সত্যের উপর থাকে। বিচারক যদি সঠিক বুঝ, বিচক্ষণতা এবং দূরর্দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী না হন, তবে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া এবং সুবিচার করা তার পক্ষে বড় কঠিন। কারণ অনেক সময় উভয় পক্ষই নিজ নিজ বক্তব্যের সপক্ষে এমনভাবে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে, যার ফলে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সহীহ বুখারি ও মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলে করীমের (স) এই বাণীটি উল্লেখ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ ۔ (بخاری مسلم)

আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। তোমরা আমার কাছে মকদ্দমা দায়ের করো। হতে পারে তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় অধিকতর বাকপটু। এমতাবস্থায় আমি যদি তার পক্ষে রায় দিয়ে দিই আর প্রকৃত সত্য পক্ষ তার ভাই-ই [অর্থাৎ অপর পক্ষ] হয়ে থাকে, তবে সেযেনো এ রায়ের বলে বিন্দুমাত্র কিছু গ্রহণ না করে। কারণ, এটা তার জন্যে অগ্নি শিখাতুল্য।

এ হাদীস থেকে প্রমাণ হলো, বিচারক তার ফায়সালা [Decree] দ্বারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে পারেননা। কিন্তু তার ফায়সালা সর্বাবস্থায়ই কার্যকর করতে হবে। তা প্রকৃত সত্যের পক্ষে হোক কিংবা বিপক্ষে, তাতে কিছু যায় আসেনা। কারণ তিনি তো সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই ফায়সালা দিয়ে থাকেন।

সুতরাং বিচারক যদি সঠিক বুঝ বিচক্ষণতা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অধিকারী না হন, তবে তার পক্ষে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তার দ্বারা জনগণের অধিকার পদদলিত হতেই থাকবে। আইন শৃংখলার অবনতি ঘটবে এবং জনগণের দুর্ভোগ বাড়তে থাকবে। এমন সব দেশ ও জাতিই এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়, যেখানে এমন সব লোকদেরকে নিজেদের বিচারাসনে বসানো হয়, যারা দীন চরিত্র ও নৈতিকতা, বুঝ জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং অর্ন্তদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির দিক থেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য।

২. রসূলুল্লাহর বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কতিপয় দৃষ্টান্ত

এক ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ বুখারির 'কিতাবুদ দিয়্যাতের' 'যদি পাথর বা লাঠি দিয়ে হত্যা করা হয়' অনুচ্ছেদে আনাস বিন মালিক (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার মদীনায় একটি মেয়ে রূপোর অলংকার পরে ঘর থেকে বের হয়। এক ইহুদি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারে। তখন মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে রসূলুল্লাহ্‌র দরবারে হাযির করা হয়। তিনি তাকে দেখে বলেন :

فُلاَنٌ قَتَلَكِ ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا . فَاَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ اَفُلاَنٌ قَتَلَكِ ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا . فَقَالَ لَهَا فِى الثَّالِثَةِ فُلاَنٌ قَتَلَكِ ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا . فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَه بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ . (صحيح البخارى)

তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল। তিনি পূণরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাকে কি অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে? সে পূণরায় মাথা উঠিয়ে সায় দিল। তিনি তাকে তৃতীয়বারও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে এবারও হাঁ সূচক মাথা নাড়লো। ফলে রসূলুল্লাহ (স) ইহুদিটিকে তাঁর কাছে হাযির হবার জন্যে ডেকে পাঠান। সে হাযির হলে তাকে দুই পাথরের মাঝে রেখে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন।

সহীহ মুসলিমের 'আলকাসামা' অধ্যায়ের 'ছুবূতুল কিসাস ফীল কাতল বিল হাজর ওয়াগায়রাহু মিনাল মুহাদ্দাদাতি ওয়াল মুছাক্কালাতি ওয়া কাতলুর রাজুলি বিল মিরআতি' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে পাথর মারার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তাকে পাথর মারা হয় এবং তাতে তার মৃত্যু হয়।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, হত্যাকারীকে সেভাবে হত্যা করতে হবে যেভাবে সে হত্যা করেছে। যেমন সে পাথর মেরে হত্যা করে থাকলে, তাকেও পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। লাঠি দিয়ে হত্যা করে থাকলে তাকেও

লাঠি পেটা করে হত্যা করতে হবে। সে গলা চেপে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে থাকলে, তাকেও সেভাবে হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ সে যে পন্থায় হত্যা করেছে তাকেও সেই পন্থায়ই হত্যা করতে হবে।

জমহুর ফকীহগণের এটাই মত। অবশ্য কুফার (হানাফি) ফকীহগণের মত ভিন্ন। তাঁরা বলেছেনঃ কেবলমাত্র ধারালো অস্ত্র দ্বারাই মৃত্যুদন্ড প্রদান করতে হবে। তাদের এ মতের ভিত্তি নুমান বিন বশীর (রা) বর্ণিত একটি হাদীস। আতে তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন 'কিসাস গ্রহণ করতে হবে শুধুমাত্র তরবারি দিয়ে।' হানাফি মাযহাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ইমাম কাসানি তাঁর 'আল বাদায়ে ওয়াসসানায়ে [পৃঃ ২৪৫ খন্ড৭]' গ্রন্থে এ মতের কথা উল্লেখ করেছেন।

নুমান ইবনে বশীর (রা) বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে জাবির আলজা'ফী নামে যে ব্যক্তিটি রয়েছেন, তিনি একজন মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত। এছাড়া বাযযার, তাহাবি, তাবরানি, দারুকুতনি এবং বায়হাকি ও শাব্দিক পার্থক্যসহ বিভিন্ন দুর্বল সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে আবি বকরাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন । কিন্তু সেটির সূত্রে মুবারক ইবনে ফুদালাহ নামে যে বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি একজন মুদাল্লিস। তিনি হাসান বসরির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ হাসান বসরি সরাসরি তার উস্তাদ নন। হাফিয ইবনে হাজর বলেন ঃ এ প্রসংগে দারুকুতনি এবং বায়হাকি আবু হুরাইরা (রা) থেকেও বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সে হাদীসের সনদে সুলাইমান ইবনে আরকম নামে যে রাবি রয়েছেন তিনি মাতরূক [বর্জিত] দারু কুতনি আলী (রা) থেকেও এ প্রসংগে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেটির সনদে লাইলা ইবনে হিলাল নামক রাবি মিথ্যাবাদী। তাবরানি এবং রায়হাকি ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সেটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। শাইখ আবদুল হক বলেছেনঃ এই হাদীসের সবগুলো সনদই জয়ীফ [দুর্বল]। ইবনে জুযিও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। বায়হাকি বলেছেন ঃ এর কোনো একটি সনদ (সূত্র) ও সুপ্রমানিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। [দেখুন ঃ আত তালখীসূল জুবায়ের ঃ ৪থ খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা]

দুই ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তার 'কিতাবুল উকূলে' আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যে ঃ 'হুযায়েল গোত্রের এক মহিলা অপর এক মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করলে তার গর্ভপাত হয়ে যায়। এ ঘটনার

মকদ্দমায় রসূলুল্লাহ (স) ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি দাস বা দাসী প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।' ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ বুখারির 'ফারায়েয অধ্যায়ে' এই অতিরিক্ত কথাটিও উদ্ধৃত করেছেন ঃ অতপর যে (অভিযুক্ত) মহিলাটিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল সে মারা যায়। তখন রসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ প্রদান করেন যেহেতু তার মীরাসের উত্তরাধিকারী হয়েছে তার সন্তান ও স্বামী, সে কারণে তার পিতৃপক্ষের নিকটাত্মীয়রাই দিয়্যত পরিশোধ করবে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহী মুসলিমে এই অতিরিক্ত কথাটিও যোগ করেছেন যে, তখন হামল বিন নাবিগা আল হুযালি বলে উঠলো ঃ 'আমি কেমন করে এমন একজনের দিয়্যত পরিশোধ করবো, যে পান করেনি আহার করেনি, কথা বলেনি চিৎকার করেনি । এর দিয়্যত প্রদান তো নিরর্থক। তার এ বক্তব্যের কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ 'এতো গনক-যাদুকরের ভাই।'

ইমাম মালিক বলেছেন : 'রসূলুল্লাহ (স) যে দিয়্যত প্রদান করতে বলেছেন সেকালে তার মূল্য ছিলো পঞ্চাশ দীনার বা ছয়শ দিরহাম।' ইব্রাহীম নখয়ী বলেছেন : 'তার প্রকৃত মূল্য ছিলো পাঁচশ দীনার। কিন্তু রসূলুল্লাহ এক পঞ্চমাংশ মূল্য পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করেন।' কারণ গর্ভপাত হওয়া সন্তানটি গর্ভেই মৃত ছিল এমন আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায়না। এ কারণে আলিমদের রায় হলো, গর্ভপাত হওয়া সন্তান যদি জীবিত পতিত হয় এবং পতিত হবার পর যদি সেই আঘাতের কারণেই তার মৃত্যু হয় যে আঘাতে পতিত হয়েছিল, তবে পূর্ণ দিয়্যত আদায় করতে হবে। কেননা, সকল বিচারে তখন সে একটি জীবন। এ মত বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায়।

তিন ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে আবু হুরাইরা এবং যায়িদ ইবনে খালিদ আল জুহহানির (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেনঃ দুই ব্যক্তি রসূলুল্লাহর দরবারে এসে একটি মকদ্দমা দায়ের করে। তাদের একজন বললোঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের বিবাদের ফয়সালা করে দিন।' দ্বিতীয়জন ছিলো অধিকতর সমঝদার ব্যক্তি। সে বললোঃ 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মীমাংসা অবশ্যি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী করুন এবং আমাকে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন।' রসূলুল্লাহ বললেন ঃ তোমার বক্তব্য বলো। সে বললো ঃ 'আমার ছেলে এই লোকটির বাড়িতে শ্রমিকের কাজ করতো। এই সুযোগে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এখন এই লোকটি আমাকে বলছে, আমার ছেলেকে

পাথর মেরে হত্যা [রজম] করা হবে। ফলে আমি ছেলের মুক্তিপণ হিসাবে একশত ছাগল এবং আমার একটি দাসী প্রদান করেছি। এরপর আমি বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা আমাকে বলেছেন, আমার ছেলের দন্ড হলো একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসন। আর তার স্ত্রীর দন্ড হলো পাথর মেরে হত্যা করা।'

রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ • أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ • (موطا امام مالك)

সেই সত্তার শপথ যার মুষ্টিবদ্ধে আমার জীবন! আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবো। আমার মীমাংসা হলোঃ তোমার ছাগল এবং দাসী তুমি ফেরত পাবে। তবে তোমার ছেলের দন্ড হলো, একশত বেত্রাঘাত আর এক বছরের নির্বাসন।' এরপর তিনি উনাইস আল আসলামীকে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে বললেনঃ যাও তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো, সে যদি ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয়, তবে তাকে রজম করবে।

হাদীসটি ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ্ বুখারিতে বিভিন্ন সূত্রে একাধিক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন 'দন্ড' অধ্যায়ের 'ব্যভিচারের স্বীকৃতি' পরিচ্ছেদে, 'বিচার বিধান' 'অধ্যায়ের বিচারকের পক্ষে ঘটনা পরিদর্শনের জন্যে কাউকে পাঠানো কি বৈধ' পরিচ্ছেদে।

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ্ মুসলিমের দন্ড অধ্যায়ের 'যে ব্যক্তি ব্যভিচারের আত্মস্বীকৃতি প্রদান করে' পরিচ্ছেদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সিহাহ সিত্তার বাকি চারটি সুনান গ্রন্থেও হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।

ছেলেটিকে পাথর না মেরে একশত বেত্রাঘাত এবং নির্বাসনের দন্ড দেবার কারণ হলো, সে অবিবাহিত ছিলো এবং ব্যভিচারের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তা নাহলে শুধু বাপের স্বীকৃতিতে ছেলেকে দন্ডিত করবার বিধান নাই।

'আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবো' রসূলুল্লাহর একথার অর্থ 'কুরআন নয়'। কারণ কুরআনে রজম এবং নির্বাসনের

উল্লেখ নেই। সুতরাং এখানে 'আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী' মানে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী যা তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে কার্যকর করেন। আর নবী তার নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো কথা বলেন না।

কেউ কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহর ইংগীত ছিলো নিম্মোক্ত আয়াতটির প্রতি 'বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করো।' তাদের বক্তব্য হলো পরবর্তীকালে এ আয়াতটি রহিত হয়ে যায়, কিন্তু বিধানটি চালু থাকে। সত্য কথা হলো তাদের এ বক্তব্য সঠিক নয়। তাছাড়া এখানে রজমের কথা থাকলেও নির্বাসনের কথাতো নেই। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই মুহাদ্দিসগণ সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

[উনাইস হলেন বিশিষ্ট সাহাবী উনাইস ইবনে দিহাক আল আসলামী। যারা উনাইসকে(রা) আনাস (রা) মনে করেছেন তারা ভুল করেছেন । কারণ তখন তিনি মাত্র কিশোর ছিলেন। দন্ড কার্যকর করার নির্দেশ তাকে দেয়া যেতোনা]

চার আবদুর রাজ্জাক তাঁর 'মুসান্নিফ' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক মহিলাকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দেয় এবংতার শিশু পুত্রটিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ফলে মহিলাটি রসূলুল্লাহর (স) দরবারে এসে ফরিয়াদ করে 'ওগো আল্লাহর রসূল! ছেলেটি আমার পেটে ছিলো, সে আমার বুকের দুধ পান করে এবং আমার কোলে শান্তি পায়, অথচ এই লোকটি আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে চায়।' ঘটনা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন,'যতোদিন তুমি পরবর্তী বিয়ে না করো ততোদিন তুমিই ওর বেশি অধিকারী।'

হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে (সনদে) মুসান্না ইবনে সাবাহ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী (রাবি) রয়েছেন। ইমাম নাসায়ি বলেছেন, এ ব্যক্তি বর্ণনাকারী হিসেবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু এছাড়াও আরো দুটি বিশুদ্ধ সূত্রে (সহীহ সনদে) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ইবনে জুরাইজের সূত্রে এবং আবু দাউদ ও হাকিম ইমাম আওযায়ীর সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তাঁরা দুজনেই (ইবনে জুরাইজ এবং ইমাম আওযায়ী) আমর ইবনে শুয়াইব থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ(স) থেকে বর্ণনা করেছেন । হাকিম বলেছেন এটি বিশুদ্ধ সূত্র। হাফিয যাহবিও হাকিমের অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আমর ইবনে শুয়াইব কর্তৃক তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অবিশ্য আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু

তা সত্ত্বেও তাঁর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটিকে 'তালাক প্রাপ্তরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সন্তান পালনের অধিকার হারিয়ে ফেলবে' একথার দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য। চারজন বড় ইমামেরও এটাই মত। এ কথাগুলো হাফিয ইবনে কাইয়্যেম তাঁর 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর এক স্ত্রীকে তালাক দিলে খলীফা আবু বকর (রা) অনুরূপ রায় প্রদান করেন। তিনি এই বলে শিশুটি তার মাকে দিয়ে দেনঃ তাঁর মা তার প্রতি অধিকার কোমল, স্নেহশীল, দয়া প্রবন ও যত্নশীল। সুতরাং সেই তার সন্তানের সর্বাধিক অধিকারিনী যতোক্ষণ না সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আবদুর রাজ্জাক ইমাম সওরির সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সওরি আসিম থেকে এবং আসিম ইকরামা থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

সিহাহ সিত্তার কোনো কোনো গ্রন্থে (অর্থাৎ আবু দাউদ নাসায়ি ইবনে মাজাহ) হাদীসটি অপর একটি সূত্রে (সনদে) নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে: মহিলাটি আরজি পেশ করলোঃ আমার (তালাকদাতা) স্বামী আমার কাছ থেকে আমার ছেলেটিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ সে আমার জন্যে আবু আনবা কূপ থেকে পানি বয়ে আনে এবং আমার অন্যান্য উপকার করে। রসূলুল্লাহ (স) ছেলেটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'বৎস'! এই হলো তোমার পিতা আর এই হলো তোমার মাতা, দুইজনের মধ্যে যার হাত ইচ্ছে তুমি ধরতে পারো। ছেলেটি তার মা'র হাত ধরলো এবং মহিলাটি ছেলেকে নিয়ে চলে গেলো। এই বর্ণনাটির সূত্র (সনদ) বিশুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি পৃথক পৃথক দুটি মকদ্দমার রায়।

পাঁচ ইমাম বুখারি তাঁর সহীহ বুখারির 'মাগাজি' অধ্যায়ের 'উমরাতুল কাযা' পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনা করেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির পরবর্তী বছর নবী করীম (স) যখন কাযা উমরা পালনের জন্যে মক্কায় আসেন, তখন যে কদিন মক্কায় অবস্থানের চুক্তি ছিলো তা পূর্ণ হলে মক্কার লোকেরা আলীর কাছে এসে বললো, তোমার সাথিকে মক্কা থেকে চলে যেতে বলো। তিনি যাত্রা শুরু করলে শহীদ হামযার (রা) একটি কন্যা পিছন থেকে চাচা...চাচা...বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসতে থাকে। আলী (রা) ওকে হাত ধরে টেনে উঠিয়ে নিয়ে ফাতিমার (রা) কাছে দিয়ে বললেন, নাও তোমার চাচার মেয়ে। যায়েদ এবং জাফর ও (রা) ওকে দাবি করে বসলো। আলী বললো, সে আমার চাচার মেয়ে তাই আমি তাকে নিয়েছি। জাফর বললো আমারও চাচার মেয়ে,

তাছাড়া ওর খালা আমার স্ত্রী। তাই ওর উপর আমার অধিকার বেশি। যায়েদ বললো সে আমার ভাইয়ের কন্যা তাই আমার অধিকার বেশি।

তাদের এ বিবাদে খালার পক্ষে রায় প্রদান করে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ওর খালাই ওর বেশি অধিকারী। কারণ খালা মায়ের সমতুল্য। আলীকে বললেন: তুমি আমার এবং আমি তোমার। জাফরকে বললেনঃ তোমার মাঝে আমার আকৃতি ও চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে। যায়েদকে বললেন: তুমি আমাদের ভাই এবং সাথি।

আমরা এখানে রসূলুল্লাহ্র বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। মনীষীগণ রসূলুল্লাহ্র জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের উপর প্রচুর আলোচনা ও লেখালেখি করেছেন। কিন্তু তাঁর বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী পৃথকভাবে সংকলন সম্পাদনার ক্ষেত্রে খুব একটা কাজ হয়নি। তবে দুজন মনীষী এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের একজন হলেন শাইখ জহীরুদ্দীন আল মরগনানি আল হানাফি (মৃত্যু ৫০১হিঃ) আর অপরজন হলেন শাইখ আল ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারজ আত তিল্লা আলকুরতবি (মৃত্যু ৪৯৭হিঃ)। তাঁদের সংকলিত গ্রন্থ দুটি মুসলিম জাহানের অমূল্য সম্পদ।

৩. ইসলামে বিচারকার্যের রীতিবৈশিষ্ট্য

ইসলামের দৃষ্টিতে বিচারকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এগুলো জানা যায় রসূলুল্লাহর (স) কর্মনীতি ও বাণী থেকে। হাদীসের সহীহ ও সুনান সংকলন গুলোতে এ সংক্রান্ত হাদীস সংকলিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের রচনাবলীতে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে আমরা হাদীস গ্রন্থাবলীর সূত্রে বিচারকের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করছি ঃ

এক ঃ ক্রোধের সময় বিচার না করা

ইমাম মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لاَ يَحْكُمُ اَحَدُكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ ·

(مسلم - ترمذی-نسائی)

কেউ যেনো ক্রোধের সময় দুইপক্ষের মাঝে ফায়সালা না দেয়।

বুখারির একটি বর্ণনায় কথাটি এ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

لاَ يَقْضِى الْقَاضِىْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ · (بخاری)

বিচারক ক্রোধের সময় দুইপক্ষের মাঝে ফায়সালা দেবেনা।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে রক্ত উত্তপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুটে উঠবার ফলে ক্রোধের সঞ্চার হয়। এসময় মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পায়। এসময় সে ন্যায় অন্যায় তারতম্য করতে পারেনা। অথচ ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলে চিহ্নিত ও স্বীকৃত করবার উপরই আল্লাহ্র শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই রসূলে করীম (স) রাগ ও ক্রোধের সময় বিচার ফায়সালা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এ সময় বিচারক তার বিবেককে আয়ত্তে রাখতে না পেরে অন্যায় ফায়সালা দিয়ে বসতে পারেন।

দুই ঃ উভয় পক্ষের কথা শুনা

আবু দাউদ ও তিরমিযি তাঁদের সুনানে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِذَا تَقَاضَى اِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْاَوَّلِ حَتّٰى تَسْمَعَ كَلَامَ الْاٰخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِىْ كَيْفَ تَقْضِىْ ‐ (ابوداود - ترمذى - حاكم)

যখন দুই ব্যক্তির বিবাদের ফায়সালা করার জন্যে তোমাকে বিচারক মানা হবে, তখন তুমি কেবল একপক্ষের কথা শুনেই রায় দিয়ে দেবেনা। রায় দেবার পূর্বে অবশ্যিই প্রতিপক্ষের কথাও শুনবে। তবেই বুঝতে পারবে, কী রায় দিতে হবে।

তিরমিযি বলেছেনঃ হাদীসটি হাসান। হাকিম বলেছেন, বিশুদ্ধ সূত্র। সহীহ্ বুখারি এবং মুসলিমে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি।

তিন ঃ বিচারকের সামনে উভয় পক্ষ সমমর্যাদায় বসবে

মুহাম্মদ ইবনে নয়ীম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমি আবু হুরাইরার (রা) একটি বিচার প্রত্যক্ষ করেছি ঃ হারিস ইবনে হাকাম এসে সেই গদীতে বসলো, যাতে আবু হুরাইরা হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আবু হুরাইরা মনে করেছিলেন হারিস অন্য কোনো কাজে এসেছেন, বিচারের জন্য নয়। এমন সময় অপর এক ব্যক্তি এসে আবু হুরাইরার সামনে বসলো। আবু হুরাইরা তাকে জিজ্ঞেস করলো সে কি কারণে এসেছে? লোকটি বললোঃ 'হারিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছি। তিনি আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছেন।' একথা শুনে আবু হুরাইরা হারিসকে বললেন ঃ উঠো বাদীর পাশে গিয়ে বসো। এটাই আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ।[১]

উভয়ের মাঝে আসনের সমতা বিধান না করে এক পক্ষকে বিচারকের পাশে বসালে তার প্রতি বিচারকের সম্মান প্রদর্শন হয় এবং তাকে যুলুম করার কাজে আস্কারা দেয়া হয়। এতে অপর পক্ষের প্রতি অবিচার হয়। ইসলামের নিয়ম হলো, বাদী বিবাদী উভয়ই বিচারকের সামনে একই সমতলে বা সমমর্যাদার আসনে বসবে।

চার ঃ উভয় পক্ষের প্রতি বিচারকের দৃষ্টিদানের সমতা

বায়হাকি এবং দারুকুতনি তাঁদের নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

১. অকী' তাঁর আখবারাতুল কাযা এবং হারিস বিন আবু উসামা তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنِ ابْتُلِىَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِى لحظه وَاشَارَتِه وَمَقْعَدِه وَمَجْلِسِه ۔ (بيهقى دار قطنى)

যাকে মুসলমানদের বিচারকের আসনে বসিয়ে অগ্নিপরিক্ষায় ফেলা হবে, সে যেনো উভয় পক্ষের মাঝে দৃষ্টিদান, লক্ষ্যারোপ, ইশারা ইংগিত ও বসার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করে।

এটা একারণে করতে হবে, যাতে করে বাদী বিবাদী কোনো পক্ষই যেনো এধারণা করতে না পারে যে, বিচারক বুঝি প্রতিপক্ষের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এমনটি হলে সে বিচারকের কাছ থেকে সুবিচার পাবার ক্ষেত্রে সংশয়ে নিমজ্জিত হবে।

পাচঁ ঃ কোনো এক পক্ষকে উচ্চস্বরে সম্বোধন না করা

বায়হাকি এবং দারুকুতনি তাঁদের নিজ নিজ সুনানে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مِنَ ابْتُلِىَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يَرْفَعْ صَوْتَه عَلَى احَدِ الْخَصْمَيْنِ مَالَمْ يَرْفَعْ عَلَى الاخرِ ۔ (بيهقى دار قطنى)

যাকে মুসলমানদের বিচারকের আসনে বসিয়ে অগ্নিপরিক্ষায় ফেলা হবে, সে যেনো একপক্ষকে উচ্চ শব্দে আর অপর পক্ষকে নিচু শব্দে সম্বোধন না করে।

এটি পূর্বোক্ত হাদীসটির অংশ।

ছয় ঃ কেবল এক পক্ষকে আপ্যায়ন না করা

ইসমাঈল ইবনে মুসলিম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন কূফায় থাকাকালে এক ব্যক্তি আলীর (রা) ঘরে এসে মেহমান হয়। এসময় সে তাঁর কাছে একটি মকদ্দমা দায়ের করে। তখন আলী তাকে বললেনঃ 'যেহেতু তুমি মকদ্দমা দায়ের করেছো এবং মকদ্দমার একটি পক্ষে পরিনত হয়েছো, সুতরাং তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে উঠো। কারণ রসূলুল্লাহ (স) মকদ্দমার কোনো একটি পক্ষকে মেহমানদারি করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। তবে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে

মেহমানদারি করতে নিষেধ করেননি। উভয় পক্ষের প্রতি সমআচরণ করা ও উভয়কে সমমর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্য তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন।'

এটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য তাবরানি হাদীসটিকে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই সূত্রের মাঝে হাইসান ইবনে গোসন বা কাসিম ইবনে গোসন নামে এক ব্যক্তি রয়েছে। লোকটি অপরিচিত (মজহুল)।

সাত ঃ উভয়পক্ষ ঠিকভাবে বসার আগে বিচারক কোনো পক্ষের কথা শুনবেন না।

আবু দাউদ এবং বায়হাকি তাঁদের নিজ নিজ সুনান গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদারক গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُجْلِسَ الْخَصْمَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْقَاضِىْ. (ابوداود - بيهقى - حاكم)

রসূলুল্লাহ (স) বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে (তাদের বক্তব্য শুরু করার আগে) বিচারকের সম্মুখে বসবার নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা এই জন্যে, যাতে করে প্রত্যেকেই ধীরে সুস্থে এবং নিশ্চিন্তে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করতে পারে।

হাকিম বলেন, ইমাম যাহবি এই বর্ণনাটিকে সঠিক বলেছেন। অবশ্য বুখারি মুসলিমে হাদীসটি উল্লেখ হয়নি।

আটঃ সাধারণ এবং মর্যাদাবান, দাস এবং স্বাধীনের সাথে সমআচরণঃ

বুখারি এবং মুসলিম তাঁদের নিজ নিজ সহীতে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّمَا النَّاسُ كَالْاِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً- (بخارى مسلم)

মানুষের উদাহরণ হচ্ছে একশ উটের মতো যার মধ্যে একটিসোয়ারী (বাহন) খুজে পাওয়া কঠিন। [বুখারি ঃ কিতাবুর রিকাক]

এর অর্থ আল্লাহর দীনে প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মানুষই সমান। যেমন একশ উটের মধ্যে সবগুলোর মর্যাদাই সমান। একশ উটের মধ্যে একটি উত্তম

সোয়ারী কদাচিৎই পাওয়া যায়। তেমনি উঁচু নিচু, ধনী গরীব, সাদা কালো সব মানুষের মর্যাদাই সমান।

সুতরাং বিচারক ধনী গরীব, শাসক শাসিত, দাস মনিব, ছোট বড় এবং শরীফ ইতরের মধ্যে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য করতে পারবেননা। এভাবেই গোটা মানব সমাজকে আইনের দৃষ্টিতে একই সমতলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

নয়ঃ ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত অবস্থায় বিচার না করা।

বায়হাকি এবং তাবরানি আবু সায়ীদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لاَ يَقْضِي الْقَاضِي اِلاَّ وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ ۔ (بيهقى - طبرانى)

বিচারক যেনো ভরা পেটে খোশমনে বিচার কার্য পরিচালনা করে।

অর্থাৎ বিচারক যেনো ক্ষুধা পিপাসা নিয়ে বিচার কার্য না করে। কারণ এতে মেজাজ উগ্র ও খিটখিটে হতে পারে।

বিচারপতি শুরাইহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিয়ম ছিলো তিনি যখন রাগান্বিত হতেন কিংবা ক্ষুধার্ত হতেন তখন তিনি বিচার কার্য স্থগিত রাখতেন । কারণ ক্ষুধা মানুষের মেজাজ ও চিন্তার উপর প্রভাব ফেলে। এতে করে সত্য উপলব্ধি করতে ব্যাঘাত ঘটে। হাদীসটির সনদে(সূত্রে) কাসিম বিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর নামে এক ব্যক্তি রয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, রাবি হিসেবে এ ব্যক্তি পরিত্যাজ্য। আবার কেউ বলেছেন রাবি হিসেবে লোকটি দুর্বল।

বিচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একথা কয়টি আমরা হাদীস ও সুন্নাহর গ্রন্থাবলীর আলোকে এখানে উপস্থাপন করলাম। একজন মুসলিম বিচারকের এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য।

৪. রসূলুল্লাহর নিযুক্ত কয়েকজন বিচারপতি

একথা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন মুসলিম উম্মাহর প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম বিচারপতি। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করেন। কুরআন ঘোষণা দিচ্ছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء : ٦٥

না, হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভুর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হবেনা, যতোক্ষণ না তারা তাদের পারস্পারিক বিবাদে তোমাকে বিচারপতি মেনে নেবে। অতপর তুমি যে ফায়সালাই দেবে, তা মেনে নিতে তাদের মন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা, বরং তোমার ফায়সালার সম্মুখে নিঃশর্তভাবে মাথা পেতে দেবে। [সূরা ৪ আননিসাঃ ৬৫]

কিন্তু যখন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে গেলো, উপদেশ নসীহত এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অধিক সময় ব্যয় করা অপরিহার্য হয়ে পড়লো, যুদ্ধ জিহাদের কাজে সময় অধিক ব্যয় হতে থাকলো, বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি দলের আগমণ বেড়ে গেলো এবং দান ও যাকাতের আদান প্রদান কাজ ব্যাপ্তি লাভ করলো আর এগুলো ছিলো রসূল এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তাঁর অপরিহার্য দায়িত্ব, তখন তিনি বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রদেশে নিজের পক্ষ থেকে বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁর নিযুক্ত বিচারপতিরা তাঁরই শিখানো আদল ও সুবিচারের মূলনীতির ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করতেন। তাঁরই শিখানো সুবিচারের ভিত্তিতে তাঁরা সালিস এবং অপরাধীদের উপর দন্ড প্রয়োগ করতেন। বঞ্চিত ও মযলুমদেরকে তাদের অধিকার আদায় করে দিতেন। ফলে আল্লাহ্র শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় কোনো শক্তিমান দুর্বলের উপর হাত বাড়াবার বিন্দুমাত্র সাহস করতে পারেনি। তাদের লালসা ও কামনার বিষদাঁত ভেংগে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

এ উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবদ্দশায় যাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়াহ্র ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করতেন। আল্লাহর আইন কার্যকর করার জন্যেই তিনি তাদের

নিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিলেন যারা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও মুরব্বি আলাইহিস সালাত ওয়াসসালামের উপস্থিতিতেই বিচার করেছেন। তাঁদের এসুযোগ দেয়া হয়েছিল বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্যে। আবার কেউ কেউ নিয়োজিত হয়েছিলেন মদিনা থেকে দূরবর্তী কোনো শহরে। তাদের প্রদত্ত রায় মদিনায় পৌঁছানো হতো। সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিকে রসূল (স) সঠিক বলে ঘোষণা দিতেন এবং বহাল রাখতেন। আবার কোনো কোনোটি ভুল হতো এবং রসূল (স) সঠিক রায় বলে দিতেন। শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ কর্মনীতি জারি থাকে এবং তিনি এমতাবস্থায় তাঁর সাথিদের ছেড়ে যান যে, তিনি তাঁদের কর্মধারার উপর রাজি ছিলেন।

১ আলী ইবনে আবী তালিব (রা)

ইনি ছিলেন আলী। পিতা আবু তালিব। দাদা আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদুল মানাফ কুরায়শি হাশেমি। তাঁর কুনিয়াহ ছিলো আবুল হাসান। ছোট্ট বেলা থেকে নবীর (স) ঘরে প্রতিপালিত হন। পুরুষদের মধ্যে পয়লা ইসলাম গ্রহণকারী। রসূলুল্লাহর কন্যা ফাতিমার স্বামী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি আমীরুল মুমিনীন নিযুক্ত হন। সাড়ে তিন মাস কম পাঁচ বছর খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। চল্লিশ হিজরির সতের রমযান শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা অগণিত গুণবৈশিষ্ট দান করেছেন। অকী' তাঁর 'আখবারুল কাযাত' গ্রন্থে রসূলুল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করেছেন ঃ

'আলী আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ বিচারক।'

এ প্রসংগে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনানে আবু দাউদের 'কাযা অধ্যায়ে' এবং ইমাম তিরমিযি তাঁর জামে তিরমিযির আহকাম অধ্যায়ে আলীর (রা) সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ 'রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ইয়েমেনে বিচারপতি নিযুক্ত করেন। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে বিচারপতি নিযুক্ত করেছেন, কিন্তু আমার বয়স যে কম। তাছাড়া বিচার ফায়সালা সম্পর্কে তো আমার তেমন অভিজ্ঞতাও নেই।'

আমার কথা শুনে তিনি বললেন ঃ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাবেন। বিবাদী যখন তোমার সামনে বসবে, তখন তুমি সে পর্যন্ত ফায়সালা দেবেনা যতোক্ষণ না দ্বিতীয়

পক্ষের (বিবাদীর) বক্তব্য শুনবে, যেভাবে শুনেছো প্রথম পক্ষের (বাদীর) বক্তব্য। কারণ সঠিক ফায়সালাটি কি তা এভাবেই তোমার কাছে পরিষ্কার হবে।" আলী বলেনঃ অতপর আমি অবিরাম বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু কখনো সংশয় নিয়ে ফায়সালা দিইনি।

এই বর্ণনাটির ব্যাপারে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আপত্তি ঃ

রসূল (স) আলীর জন্যে যে দোয়া করেছেন সে ব্যাপারে মু'তাযিলা এবং অন্য কয়েকটি বিপথগামী সম্প্রদায় আপত্তি তুলেছে। এ দোয়ার ভিত্তিতে বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সংশয় দূরিভূত হয়ে গেছে বলে তিনি যে দাবি করেছেন সে ক্ষেত্রে তারা আপত্তি তুলেছে। তাদের বক্তব্য হলো এটি এমন একটি দাবি যা দৃষ্টিভংগি এবং বর্ণনা উভয় দিক থেকে অসত্য। দৃষ্টি ভংগির দিক থেকে এটি অসত্য একারণে যে, মানুষ কোনো অবস্থাতেই ভুলত্রুটির উর্ধ্বে উঠতে পারেনা। এটা মানুষের সহজাত ব্যাপার। অথচ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রসূল (স) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তোমার যবান দিয়ে সঠিক ফায়সালা প্রকাশ করাবেন এবং তোমার অন্তরকে সঠিক পথ দেখাবেন।

তাদের মতে বর্ণনাগত দিক থেকেও এটি অসত্য। কারণ রসূলুল্লাহর (স) মৃত্যুর পর তিনি (আলী) বেশ কিছু ফায়সালা এমন দিয়েছেন, সঠিক

প্রমাণিত না হওয়ায় একদল সাহাবী সেগুলোর সাথে মত পার্থক্য করেছেন এবং তিনি মত প্রত্যাহার করেছেন। তাবেয়ী এবং ফকীহগণও তাঁর সেসব মত গ্রহণ করেননি। তাঁর এরূপ কয়েকটি মত এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

১. 'উম্মুল ওলাদ' সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন রকম মত দিয়েছেন। প্রথমে এ সম্পর্কে তিনি একটি মত প্রকাশ করেন। পরে আবার সে মত প্রত্যাহার করে নেন।

২. দন্ড সম্পর্কে তিনি যেসব ফায়সালা দেন সেগুলো পরস্পর বিরোধী।

৩. তিনি মুরতাদদের পোড়ানোর সাজা দেন। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন এব্যাপারে ইবনে আব্বাসের ফতোয়া জানতে পারেন, তখন নিজ ফায়সালার জন্যে লজ্জিত হন।

৪. তিনি হাতিবের মুক্ত দাসীকে পাথর মেরে হত্যা করার ফায়সালা দেন। পরে তিনি উসমান (রা)-এর এই বক্তব্য শুনতে পান যে ঃ 'দন্ড তার উপর প্রযোজ্য, যে দন্ড সম্পর্কে অবগত।' কিন্তু দাসীটি অনারব হবার কারণে আরবি ভাষা জানতনা এবং দন্ড সম্পর্কেও অবহিত ছিলনা। উসমানের (রা) বক্তব্য শুনার পর তিনি সেটাকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেন।

৫. পঞ্চাশ বছর বয়েসের এক ব্যক্তিকে তিনি আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করেন। এতে লোকটি মারা যায়। এতে করে তিনি তার দিয়্যত প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের মাঝে পরামর্শ করে দিয়্যত প্রদান করেছি।

৬. তিনি তাঁর নিম্নোক্ত ফায়সালা সমূহও প্রত্যাহার করেনঃ

ক.পানাহারের ক্ষেত্রে আল্লাহর হারাম করা বস্তু শুধু তিনটি।

খ. চোরের হাত কাটতে হবে আংগুলের গোড়া থেকে।

গ. তিনি শিশু চোরদের আংগুল রগড়ে নষ্ট করে দেবার মত প্রদান করেছিলেন।

ঘ. শিশুদের একের বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন।

এসব আপত্তির জবাবঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা (মৃত্যু ২৭৬ হিঃ) তাঁর 'তাবীল মুখতালিফুল হাদীস' গ্রন্থে এই সবগুলো আপত্তিরই জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আলীর যবান দিয়ে সত্য ও সঠিক ফায়সালা প্রকাশ হবার দোয়া করেছেন, তার উদ্দেশ্য এই ছিলনা যে তার দ্বারা আর কখনো কোনো অবস্থাতেই ভুলভ্রান্তি হবেনা। কারণ ভুলের উর্ধ্বে তো কেবল আল্লাহ। কোনো সৃষ্টির জন্যে এ সিফাত প্রযোজ্য হতে পারেনা। তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য তো এই ছিলো যে আলীর অধিকাংশ ফায়সালা সঠিক হোক। তার কথা বার্তায় সত্য ও ন্যায় বিজয়ী থাকুক। ব্যাপারটা ঠিক এরকম যেমন রসূলে করীম (স) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্যে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা যেনো তাকে দীন এবং কুরআনের বুঝ দান করেন। কিন্তু তাঁর এই দোয়া সত্ত্বেও ইবনে আব্বাস (রা) গোটা কুরআনের পূর্ণাংগ জ্ঞান রাখতেন না। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ আমি 'হানানান' 'আউয়াহুন' 'গিসলীন' 'রাকীম' শব্দাবলীর অর্থ জানিনা।

কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া সত্ত্বেও আলীর (রা) ব্যাপারে একথা মনে রাখা দরকার যে, তিনি এমনসব জটিল ব্যাপারেও সঠিক ফায়সালা দিয়েছেন, যেগুলো উমর (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহবীগণও বুঝে উঠতে পারেননি। এজন্যেই উমর (রা) বলতেন, 'আলী না থাকলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।' তিনি আরো বলেছেনঃ এমন সব সমস্যা ও জটিলতা থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই, যেগুলো আবুল হাসান (আলী) বর্তমান না থাকলে সমাধান করতে পারবনা।

একই ভাবে রসূলে করীম (স) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের জন্যে যেমনঃ উমর, আবু হুরাইয়া, হাসসান বিন সাবিত, এবং মুয়াবিয়া প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু

আনহুমের জন্যে যে দোয়া করেছিলেন, সেগুলোরও এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে যে, সেগুণ গুলো যেনো তাদের মাঝে বিজয়ী থাকে, সর্বাধিক থাকে এবং অধিকাংশ সময় থাকে। রসূল (স) কখনো সাহাবীদের অতিমানব হবার জন্যে দোয়া করেননি। বরঞ্চ বিভিন্ন মানবীয় গুণ সর্বাধিক লাভ করার জন্যে দোয়া করেছিলেন। রসূলের দোয়ার এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

২ মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)

ইনি হলেন মুয়ায বিন জাবাল বিন আমর ইবনে আউস আবু আবদুর রহমান আল আনসারি আলখাজরাজি। তিনি হালাল এবং হারাম সংক্রান্ত ইলমের শ্রেষ্ঠ ইমাম ছিলেন। আবু ইদরীস খাওলানি বলেছেনঃ তিনি ছিলেন উজ্জ্বল ফর্সা। মুখমন্ডল ছিলো জ্যোতির্ময়। দাঁত ছিলো ঝকঝকে শানিত । চোখ ছিলো সুরমা লাগানো চোখের মতো কালো।

কা'ব ইবনে মালিক বলেছেন ঃ মুয়ায ছিলেন ফর্সা, সৌন্দর্যের প্রতীক এক বলিষ্ঠ যুবক। ছিলেন মার্জিত ও ভদ্রস্বভাবের সুরুচিবান। তাছাড়া তিনি তাঁর গোত্রে যুবকদের মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম যুবক।

ওয়াকেদি বলেছেনঃ মুয়ায সবগুলো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। রসূলুল্লাহ(স) থেকে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে বড় বড় সাহাবি এবং তাবেয়িগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আদি ইবনে আবী আওফা আশ'আরী, আবদুর রহমান ইবনে সামুরা, জাবির ইবনে আনাস এবং আরো অনেকে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ।

আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) তাঁকে বড় সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। উমর বলতেন ঃ 'মহিলারা মুয়াযের মতো পুরুষ জন্ম দিতে অক্ষম। মুয়ায না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।'

কায়াব ইবনে মালিক বলেছেনঃ 'রসূলুল্লাহর (স) জীবদ্দশায় মুয়ায মদীনায় ফতোয়া প্রদান করতেন। একইভাবে আবু বকরের আমলেও তিনি ফতোয়া দিতেন।একথা বলেছেন ইবনে সা'আদ তাঁর তাবকাতে।'

সাইফ তাঁর 'আল ফতুহ' গ্রন্থে উবায়েদ ইবনে সখর-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে,রসূলুল্লাহ মুয়াযকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার কালে বলেছিলেন ঃ

انى قد عرفت بلائك فى الدين والذى قد ركبك من الدين وقد طيب لك الهدية فان اهدى اليك فاقبل .

দীনের ব্যাপারে তোমার অসুবিধা আমি জানি। আর তুমি যে ঋণে ডুবে আছো তাও আমি জানি। তাই আমি তোমার জন্যে হাদিয়া গ্রহণ বৈধ ও পবিত্র ঘোষণা করছি। কেউ যদি তোমাকে হাদিয়া প্রদান করে গ্রহণ করবে।

সাইফ একই সূত্রে আরো বলেছেন, নবী করীম (স) ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে তাকে বিদায় জানাবার সময় এই দোয়াও করেছিলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা তোমার সামনে পিছনে, ডানে বামে এবং উপরে নিচে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখুন। আর তোমাকে জিন ও মানুষের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখুন। [হাফেয ইবনে হাজর ঃ আল ইসাবা]

ইতিহাস ও জীবনীবেত্তাগণ তাঁদের গ্রন্থাবলীতে মুয়াযের (রা) বিস্তারিত গুণ বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করেছেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে বিচারক হিসেবে রসূলুল্লাহ(স) কর্তৃক তাঁর প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু দাউদ তার সুনানে 'বিচার ফায়সালা' অধ্যায়ের 'বিচারের ক্ষেত্রে রায় ইজতেহাদ করা' পরিচ্ছেদে এবং ইমাম তিরমিযি তাঁর জামে তিরমিযির 'আহকাম' অধ্যায়ের বিচারক কিভাবে রায় দেবে পরিচ্ছেদে হারিছ ইবনে আমর ইবনে আখিস সগিরা ইবনে শু'বা থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হারিছ বর্ণনা করেছেন, হামস্ শহরস্থ মুয়ায ইবনে জাবালের কিছু সংখ্যক সাথির নিকট থেকে শুনে। রসূলুল্লাহ (স) যখন মুয়াযকে ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন মুয়াযকে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে মুয়ায! তোমার কাছে যখন কোনো মকদ্দমা দায়ের করা হবে, তুমি কিভাবে তার ফায়সালা করবে? মুয়ায বললেনঃ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, বিষয়টির ফায়সালা যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও তখন কি করবে? মুয়ায বললেনঃ সে ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহর সুন্নাহর ভিত্তিতে ফায়সালা করবো। রসূলুল্লাহ জানতে চাইলেনঃ যদি আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাহর কোনোটিতে সে বিষয়ের ফায়সালা না পাও সে ক্ষেত্রে কি করবে? মুয়ায বললেন, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাহর আলোকে ইজতেহাদ করবো,এতে কোনো প্রকার ত্রুটি করবনা। তার জবাব শুনে

রসূলুল্লাহ তার বক্ষদেশে হাত মেরে বললেন ঃ

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ. (ابوداؤد - ترمذى)

শোকর সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর রসূলের সাথিকে এমন যোগ্যতা দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রসূল সন্তুষ্ট।

ঘটনাটি একথারই প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহর জীবদ্দশাতেই মুয়ায ইয়েমেনে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন।

মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহু সতের হিজরিতে প্লেগে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়াতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র চৌত্রিশ বছর। তাঁর প্রতি বর্ষিত হোক আল্লাহর অসীম করুণারাজি।

৩ আল আ'লা ইবনে হাজরামি (রা)

তাঁর পূর্ণ নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইমাদ ইবনে আকবর ইবনে রবিয়া আলহাজরামি। তাঁর পিতা মক্কায় এসে বসবাস করেন এবং আবু সুফিয়ানের পিতা উমাইয়া ইবনে হারবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। তাঁর বেশ ক'জন ভাই ছিলো। একভাই ছিলেন আমর ইবনে হাজরামি, মুশরিকদের মধ্যে ইনি প্রথম নিহত ব্যক্তি। আবদুল্লাহ ইবনে জহশ ও তাঁর সাথিরা একে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরাইশ নেতারা মুশরিকদের চরমভাবে উত্তেজিত করে তোলে। তারা প্রোপাগান্ডা করতে থাকে যে, মুহাম্মদ এবং তার সাথিরা নিষিদ্ধ মাসের পবিত্রতা নষ্ট করেছে। নিষিদ্ধ মাসে তারা হত্যা কান্ড ঘটিয়েছে, মালামাল লুট করেছে এবং আমাদের লোকজন গ্রেফতার করেছে। এ পেক্ষিতেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۔ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۔ (البقرة : ٢١٧)

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা যায় কিনা তোমাকে তারা সেবিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। তুমি বলোঃ এ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা বড় (অপরাধ)। কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধাদেয়া, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করা, মসজিদে হারামে আসতে মানুষকে বাধা দেয়া এবং হারামের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করা আল্লাহর দৃষ্টিতে তার চাইতেও বড় অপরাধ। আর ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যার চাইতেও কঠিনতর অপরাধ। [সূরা ২ আলবাকারা ঃ ২১৭]

কুরাইশদের প্রোপাগান্ডার ফলে মুসলমানরা যে দ্বিধা দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, এ আয়াত অবতীর্ণের ফলে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেলো। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে বর্তমান রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্যে সেসব গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

আ'লা ইবনে হাজরামি ইসলাম কবুল করেন। সাহাবিদের মধ্যে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ এবং আবু হুরাইরা তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বাহরাইনের বিচারপতি নিয়োগ করেন। হারিস ইবনে উসামা তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আ'লা ইবনে হাজরামিকে এক দীর্ঘ পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। পত্রের প্রথমাংশ এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ পত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নবীউল উম্মী আল কুরায়শি আল হাশেমি আল্লাহর রসূল ও নবীর পক্ষ থেকে আ'লা ইবনে হাজরামি ও তার সাথি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত নির্দেশনামা। হে মুসলমানরা, তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো। আমি আ'লা ইবনে হাজরামিকে তোমাদের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছি। আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি এক-লা-শারীক আল্লাহকে ভয় করার, তোমাদের সাথে কোমল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করার এবং তোমাদের ও সমস্ত মানুষের মাঝে আল্লাহর সুবিচার পূর্ণ কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবার। আর আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে যতোক্ষণ আমার এই সব নির্দেশ পালন করবে, সুবিচার করবে এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবে, ততোক্ষণ তোমরা তার কথা শুনবে, তার কথা মেনে চলবে এবং তার সাহায্য সহযোগিতা করবে। তোমাদের আনুগত্য লাভের যে বিরাট অধিকার আমার আছে তোমরা তার সঠিক হক আদায় করতে পারবেনা।[১]

---

১. হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি তার মুতালিবুল আলিয়া গ্রন্থের ২য় খন্ড ২৩৭ পৃষ্ঠায় এ পত্রটি উদ্ধৃত করেছেন।

এটি আল্লাহর রসূলের সেই দীর্ঘ পত্রের একাংশ। পত্রটি লিখেছিলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু। ভাষা বলে দিয়েছিলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম। যেমন, আবুযর আল গিফারি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামন আল আবাসি, সা'আদ ইবনে উবাদা আনসারি প্রমুখ রাদিয়াল্লাহু আনহুম। এঁদের উপস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (স) পত্রটি খালিদ ইবনে অলীদের হাতে দিয়ে তা আলা ইবনে হাজরামিকে পৌঁছাবার নির্দেশ দেন। আ'লা ইবনে
হাজরামির উপর কোনো বিপদ ঘটে থাকলে তিনি খালিদকে তার স্থলে দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দেন।

৪ মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা)

তাঁর কুনিয়াহ ছিলো আবু আলী, আবার কেউ কেউ বলেছেন আবু আবদুল্লাহ আল মুযান্নি। মুযান্নি এসেছে মুযীনা থেকে। মুযীনা ছিলেন উসমান ইবনে আমরের মাতা। মা'কাল এ বংশেরই লোক।

মা'কাল হুদাইবিয়ার সন্ধির আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। বগবি বলেছেন ঃ মা'কাল উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে বসরায় একটি নহর খনন করেন। তাঁর নামে এটির নাম করা হয় 'নহরে মা'কাল'। তিনি বসরাতে নিজের আবাস স্থাপন করেন এবং সেখানেই মুয়াবিয়া (রা)-এর খিলাফত আমলে ওফাত লাভ করেন।

মা'কাল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া নুমান ইবনে মাকরান, ইমরান ইবনে হুসাইন, আমর ইবনে মাইমুন আল আওদি, আবু উসমান আননাহদি এবং হাসান বসরি থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারি মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তার গ্রন্থাবলীতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে।

মা'কাল স্বয়ং রসূলুল্লাহর নিযুক্ত বিচারপতিদের একজন ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরকে মা'কালের সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে লোকদের মাঝে বিচার ফায়সালা করবার নির্দেশ প্রদান করেন। আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার মধ্যে কি বিচার ফায়সালা করবার যোগ্যতা আছে? তিনি বললেন 'ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বিচারককে সাহায্য করেন, যতোক্ষণ সে ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায় অবিচার ও বাড়াবাড়ি না করে।'[২]

এ হাদীসটির সপক্ষে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাবরানি যায়িদ ইবনে আরকাম থেকে ঠিক অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে একথা কয়টি বেশি আছে ঃ "যতোক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো সন্তুষ্টি অর্জন বিচারকের লক্ষ্য না হবে, ততোক্ষণ আল্লাহ তাকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করবেন।"[৩]

তিরমিযি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰـــــهَ مَعَ الْقَاضِيْ مَالَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ . (ترمذي)

আল্লাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত বিচারককে সাহায্য করেন যতোক্ষণ না সে যুলম করে। কিন্তু যখনই সে যুলম করে তখন আল্লাহ তার সংগ ত্যাগ করেন আর শয়তান তার উপর চেপে বসে।[৪]

৫ আমর ইবনুল আস্ আল কুরায়শি (রা)

তাঁর উপাধি ছিলো 'আসসাহমি'। কুনিয়া ছিলো আবু আবদুল্লাহ বা আবু মুহাম্মদ। মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরির সফর মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেছেন, হুদাইবিয়ার সন্ধি এবং খায়বর যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যুবায়ের ইবনে বাক্কার এবং ওয়াকেদি পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনুল আস হাবশার সম্রাট নাজ্জাশির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যুবায়ের ইবনে বাক্কার আরো বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি আমরকে জিজ্ঞেস করে ঃ আপনার মতো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিয়েছিল কিসে? তিনি বলেন ঃ আমরা এমন লোকদের সাথে ছিলাম, আমাদের উপর যাদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো আর তাদের অন্তর ছিলো সন্দেহ সংশয় ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত । অতঃপর আল্লাহ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে অস্বীকার করে। আমরাও তাদের

---

২. কানযুল উম্মাল।
৩. মুসনাদে আহমদ ৫ম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।
৪. জামে তিরমিযি, কিতাবুল আহকাম। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, এটি একটি 'হাসান গরীব হাদীস'।

অনুসরণ করি । অতপর তারা যখন বিদায় নিলো, নেতৃত্ব আমাদের হাতে চলে এলো। আমরা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখলাম। ফলে সত্য আমাদের আকৃষ্ট করে। আমার অন্তরে ইসলামের আহবান স্থান করে নেয়। তাদের সাথে আমার সহযোগিতার অভাব ও অনাগ্রহ দেখে কুরাইশরা ইসলামের প্রতি আমার ঝুঁকে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পারে। ফলে তারা আমার কাছে এক যুবককে পাঠায়। সে এসে আমাকে বুঝাবার চেষ্টা করে এবং আমার সাথে বাহাছে লিপ্ত হয়। আমি তাকে বলি ঃ তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি তোমার এবং তোমার পূর্বেকার ও পরের লোকদের রব, বল দেখি, আমরা অধিক হিদায়াতে আছি নাকি পারস্য এবং রোমের লোকেরা? সে বললো ঃ আমরা অধিকতর হিদায়াতের উপর আছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তাহলে আমরা অধিক সুখে আছি নাকি তারা? সে বললোঃ তারা অধিক সুখে আছে। এবার বললামঃ আমদের এই মর্যাদা কি কাজে আসবে যদি আমরা পৃথিবীতে তার সুফল লাভ করতে না পারি? পৃথিবীতে সকল ব্যাপারেই তো তারা আমাদের উপরে আছে। শুনো, মুহাম্মদ যে বলছেন, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে যাতে করে সৎ লোকদেরকে তাদের সৎকর্মের আর অসৎ লোকদের তাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল দেয়া যায়, একথাটাকে আমি সত্য ও বাস্তব বলে মনে করি। সুতরাং মিথ্যা পথে অগ্রসর হয়ে কোনো লাভ নেই।" [আল ইসাবা ঃ ইবনে হাজর আসকালানি]।

আমর ইবনুল আস ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর ছিলো অসংখ্য গুণবৈশিষ্ট। তিনি মিশর বিজয় করেন। তিনি ফিলিস্তীনের গর্ভণর ছিলেন। সিফফীনের যুদ্ধে মু'আবিয়া (রা) তাঁকে সালিশ নিয়োগ করেছিলেন, যেমন আলী(রা) নিয়োগ করেছিলেন আবু মুসা আশআরি (রা) কে।

বিচারপতি নিয়োগকালে নবী করীম (স) তাঁকে যেসব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ বিচারপতি নিয়োগ কালে নবী করীম (স) তাকে যেসব নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে আহমদে আবুন নস্‌র থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ফারজ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আ'লা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ বলেছেন ঃ দুটি লোক বিবাদ করতে করতে রসূলুল্লাহর দরবারে এসে হাযির হয়। রসূলুল্লাহ (স) আমরকে বললেন ঃ আমর এদের মাঝে ফায়সালা করে দাও। আমর বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! একাজের জন্যে আমার চাইতে আপনিই উত্তম।

তিনি বললেন ঃ তা সত্ত্বেও তুমিই ফায়সালা করে দাও। আমর বললেন ঃ তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিলে আমি কী কল্যাণ লাভ করবো? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ

اِنْ اَنْتَ قَضَيْتَ بَيْنَهُمَا فَاَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَاِنْ اَنْتَ اجْتَهَدْتَ فَاَخْطَاْتَ فَلَكَ حَسَنَةٌ - (مسند احمد)

তুমি যদি তাদের মাঝে ফায়সালা করে দাও আর তোমার রায় যদি সঠিক হয় তবে তুমি দশটি নেকি লাভ করবে। আর রায়ের ক্ষেত্রে তোমার ইজতিহাদ যদি ভুল হয়, তবু একটি নেকি লাভ করবে।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে নবী করীম (স) আমরকে(রা) বিচারকার্যে উৎসাহিত করেছেন। নিষেধ করেননি। সত্যে উপনীত হবার এবং সুবিচার করার জন্যে যে বিচারক আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে, এখানে তিনি তার প্রশংসা করেছেন। সঠিক ফায়সালা করতে পারলে যে বিচারক দশটি নেকী লাভ করবে, নবী করীম (স)-এর এ বাণীর সমর্থন পাওয়া যায় আল কুরআনের এ আয়াতটি থেকে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۰ (سورة الانعام : ١٦٠)

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, তার জন্যে রয়েছে দশগুণ পুরস্কার।" [সূরা আনআমঃ ১৬০]

আর রসূলুল্লাহ (স) যে বলেছেন, রায়ের ক্ষেত্রে তোমার ইজতিহাদ ভুল হলেও একটি নেকি লাভ করবে, এর অর্থ এই নয় যে, ভুলের জন্যে নেকি লাভ করবে। বরং নেকি লাভ করবে সত্যে উপনীত হবার জন্যে বিচারক যে ইজতিহাদ ও চিন্তা গবেষণা করেন সে জন্যে। আসল কথা হলো, বিচারককে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইলমের অধিকারী হতে হবে। তাছাড়া তাকে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইজতিহাদ করবার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। আর কোনো অজ্ঞ অযোগ্য ব্যক্তি যদি বিচারকের আসনে বসে তবে তার ক্ষেত্রে নবী করীম (স) এর নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য হবেঃ

اَلْقَضَاةُ ثَلٰثَةٌ مِنْهُمْ قَاضٍ يَقْضِيْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ مِنَ النَّارِ وَاِنْ اَصَابَ ..... الخ

বিচারক তিন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একপ্রকার বিচারক হলো তারা, যারা অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করে। এরূপ বিচারকরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, এমন কি তাদের রায় সঠিক হলেও......।

বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী আমর ইবনুল আ'স (রা) তেতাল্লিশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানি এটিকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বর্ণনা বলেছেন।

৬ উকবা ইবনে আমের (রা)

ইনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি উকবা ইবনে আমের আল জুহহানি (রা)। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন একদল সাহাবি ও তাবেয়ি (রা)। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু উমামা, জুবায়ের ইবনে নুফায়ের, বা'জা ইবনে আবদুল্লাহ আলজুহহানি, আবু ইদরীস খাওলানি এবং অন্য আরো কতিপয় ব্যক্তি।

আবু সায়ীদ ইবনে ইউনুস তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ

তিনি কুরআন, ফিকহ এবং বিশেষভাবে উত্তরাধিকার শাস্ত্রের উপর একজন বড় পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। একজন বড় মানের কবি, লিখক এবং কুরআন সংগ্রহকারী সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন।

একবার দু'ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়। তিনি উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাদের বিবাদ মীমাংসা করে দেবার নির্দেশ দেন।

দারু কুতনি সনদসহ উকবা ইবনে আমেরের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, একবার দু'ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়। এসময় তিনি বললেন, উকবা উঠো এদের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রসূল! একাজে আপনি আমার চেয়ে উত্তম।' তিনি পূণরায় বললেন, তা সত্ত্বেও যাও ফায়সালা করো। ইজতিহাদ করে তুমি যে ফায়সালা দেবে তা যদি সঠিক হয় তবে দশগুণ পুরস্কার পাবে। আর ভুল হলেও একটি পুরস্কার পাবে।

হাদীসটির সূত্রে আবুল ফারজ বিন ফুজালা নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন। তবে হাদীসটির মর্ম যথার্থ। কারণ অপর কয়েকটি সূত্রে একই বক্তব্য আবু হুরাইরা প্রমুখ থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

৭ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আল আবাসি

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের একজন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস শুনে বর্ণনা করেছেন অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জাবির, জন্দুব, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ এবং আবুত তোফায়েল প্রমুখ। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় সমূহের দায়িত্ব পালন করতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট পৃথিবীতে প্রকাশিতব্য ফিতনা সমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি কোনো জানাযায় শরীক হলে উমরও তাতে শরীক হতেন। তিনি কোনো জানাযায় উপস্থিত হতে আপত্তি করলে উমরও তাতে শরীক হতেননা। তাঁর গুণবৈশিষ্ট অসংখ্য।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দুই পক্ষের একটি কুঁড়েঘর বিষয়ক বিবাদ মীমাংসার জন্যে ইয়ামামায় পাঠিয়েছিলেন। ইবনে শু'বান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেনঃ দুই ব্যক্তি একটি বিষয়ের বিবাদ নিয়ে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হয়। ইমাম নাসায়ি তাঁর 'আল আসমা ওয়াল কুনিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ইয়ামামায় একটি বাগান নিয়ে দুই ব্যক্তির মাঝে বিবাদ বাঁধে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুযাইফা ইবনে ইয়ামানকে ইয়ামামা পাঠান। হুযাইফা দুইজনের একজনের পক্ষে রায় দেন। রায় তার পক্ষে দেন যে ঐ রশিটির অধিকতর নিকটে ছিলো, যে রশিটি দিয়ে কুঁড়ে ঘরটি বাঁধা ছিলো। ফিরে এসে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফায়সালার বিবরণ জানালে রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ 'উত্তম ফায়সালা করেছো।'

দারুকুতনিএ হাদীসটি দাহশান ইবনে ফিরানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী জয়ীফ। ইবনে মাজাহ এটি বর্ণনা করেছেন নামিরান ইবনে জারিয়ার সূত্রে । ইনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি।

৮ আত্তাব ইবনে উসায়েদ

ইনি হলেন আত্তাব ইবনে উসায়েদ ইবনে আবীল আ'স ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস আল উমুবি আবু আবদুর রহমান মতান্তরে আবু মুহাম্মদ। তাঁর মা ছিলেন যয়নব বিনতে উমর ইবনে উমাইয়া। মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। সৎ এবং বহু গুণে গুণান্বিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিলো বিশের কিছু বেশি।

আল মাওরুদি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাব ইবনে উসায়েদকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মক্কার শাসক ও বিচারপতি নিয়োগ করেন। নিয়োগকালে তিনি তাকে নির্দেশ দেনঃ

يَاعَتَّابُ، اِنْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَالَمْ يَقْبِضُوْا وَعَنْ رِبْحِ مَالَمْ يَضْمَنُوْا

(ادب القاضى للماوردى ج/١ ص/١٣١)

হে আত্তাব! লোকদের সেসব জিনিসের কেনাবেচা করতে নিষেধ করবে, যা তাদের কজায় নেই এবং সেইসব জিনিসের লাভ গ্রহণ করতে বারণ করবে, যেগুলোর সংরক্ষণের দায় দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেনি।[৫]

আল খাওয়ারেজমি আবু হানীফা থেকে, তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহেব আততাইমি আল কারশি আলকুফি থেকে, তিনি আমের আশ শাবী থেকে এবং তিনি আত্তাব ইবনে উসায়েদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (উসায়েদকে) নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেনো তাঁর কওমকে নিষেধ করেন ঃ

১. দখলে যা কজায় না থাকা জিনিস বিক্রয় করতে,

২. একটি পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দুইটি শর্তপ্রয়োগ করতে। [যেমন নগদ ক্রয় করলে এই দাম আর বাকি হলে এই দাম],

৩. এমন পণ্যের লাভ গ্রহণ করতে যার সংরক্ষণের দায়িত্ব সে গ্রহণ করেনি। এবং

৪. বাইয়ে সল্ফ [৬] থেকে।[৭]

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্তাবকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আত্তাব মুনাফিকদের ব্যাপারে ছিলেন কঠোর। মুমিনদের ব্যাপারে ছিলেন কোমল। আত্তাব বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, জামাতে নামায পড়েনা এমন ব্যক্তির সন্ধান যদি আমি পাই তাকে হত্যা করবো। কারণ মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামাত ত্যাগ করেনা। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এক কঠোর রুক্ষ বেদূঈনকে মক্কার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন। জবাবে রসূলুল্লাহ তাদের বলেন ঃ

---

৫. আল মাওরুদি ঃ আদাবুল কাযি ১ম খন্ড, ১৩১ পৃষ্ঠা।

৬. ভবিষ্যতে মূল্য প্রদানের শর্তে মাল ক্রয় করা।

৭. মুসনাদে আবু হানীফা ঃ ২য় খন্ড, ৬-৭ পৃষ্ঠা।

إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ أَتَى بَابَ الْجَنَّةِ فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَقَعْقَعَهَا حَتَّى فُتِحَ لَهُ وَدَخَلَ ۔ (الاصابه)

আমি স্বপ্ন দেখেছি, উসায়েদ জান্নাতের দরজায় এসে দরজার জিঞ্জীর ধরে সজোরে নাড়া দিয়েছে। ফলে দরজা খুলে গেলো এবং আত্তাব জান্নাতে প্রবেশ করলো।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি আল ইসাবা গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

উসায়েদ ১৩ হিজরিতে আবু বকরের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ওফাতের দিন ইন্তেকাল করেন।

৯ দিহইয়া কালবি

ইনি হলেন দিহইয়া ইবনে খলীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু। কুযায়া কবীলার লোক ছিলেন তিনি। ইসলামের সূচনা কালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর চেহারা ছিলো অবিকল জিবরাঈলের চেহারার মতো।

ইবনে সা'আদ তাঁর তবকাতে উল্লেখ করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তিকে তিন জনের অবিকল বলে জানিয়েছেন। তারা হলো ঃ

دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ يُشْبِهُ جِبْرَائِيلَ وَعُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ يُشْبِهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَعَبْدُ الْعُزَّى يُشْبِهُ الدَّجَّالَ ۔ (طبقة ابن سعد)

১. দিহইয়া কালবি অবিকল জিবরাঈলের মতো,

২. উরওয়া ইবনে মাসউদ আস সাকাফি ঈসা ইবনে মরিয়মের মতো এবং

৩. আবদুল উযযা (অর্থাৎ আবু লাহাব) দাজ্জালের মতো।

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِجِبْرَائِيلَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ ۔ (بن سعد)

"আমি জিব্রীলকে দিহইয়া কালবির সদৃশ দেখতে পেয়েছি।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ জিব্রীল দিহইয়া কালবির সাদৃশ্যে আমার কাছে আসতেন।

দিহইয়া ছিলেন রসূলুল্লাহ কর্তৃক রোম সম্রাট কাইজারের কাছে প্রেরিত সেই ঐতিহাসিক পত্রের বাহক।

আল মাওরুদি বলেছেন, রসূলুল্লাহ(স) দিহইয়া কালবিকে ইয়ামেনের একটি অঞ্চলের বিচারক নিয়োগ করেছিলেন এবং তিনি জিব্রীলের সদৃশ ছিলেন।[৮]

১০ আবু মূসা আশআরি

তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস এবং কুনিয়াহ আবু মূসা। তিনি আশআর গোত্রের লোক ছিলেন। আবু মূসা আশআরি হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত। তবে মূল নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতা তাইয়্যেবা বিনতে ওহাব ইবনে আলী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনাতে মৃত্যুবরণ করেন।

আবু মূসা রমলায় বসবাস করতেন। পরে সায়ীদ ইবনুল আ'সের সাথে তিনি মিত্রতা স্থাপন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর হাবশায় হিজরত করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হাবশায় হিজরত করেননি। বরং স্বীয় জন্মস্থান ইয়েমেনে ফিরে যান। একারণেই মূসা ইবনে উকবা ইবনে ইসহাকও ওয়াকেদি প্রমুখ ইতিহাসবেত্তা তাঁকে হাবশায় হিজরতকারীদের মধ্যে গণ্য করেননি। খায়বর বিজয়ের পর তিনি মদীনায় আগমন করেন। ঘটনাক্রমে তার নৌকা এবং জাফর ইবনে আবু তালিবের নৌকা একইসাথে ঘাটে ভিড়ে এবং তাঁরা একত্রে মদীনায় উপস্থিত হন। উল্লেখ্য জাফর ইবনে আবী তালিব হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং হাবশার মুহাজিরদের নেতা ছিলেন।

ওকী' বলেছেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসাকে শাসনকর্তা অভ্যন্তরে বিচারপতি হিসেবে ইয়েমেনে পাঠান।[৯]

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানি আল ইসাবা গ্রন্থে লিখেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসাকে ইয়েমেনের কিছু অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠান। এ অঞ্চলগুলো ছিলো যুবায়েদ, এডেন ও

৮.আল মাওরুদি ঃ আদাবুল কাযা, ১ম খন্ড ১৩২পৃষ্ঠা।
৯.ওকী ঃ আখবারুল কাযাত ঃ ১ম খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা।

আশে পাশের এলাকা। আমীরুল মুমিনীন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মুগীরার পরে বসরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে আহওয়ায এবং পরে ইসপাহান বিজয় করেন। অতপর আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কুফার গর্ভণর নিয়োগ করেন। তিনি সিফফীনে দুই শালিশের একজন ছিলেন।

আবু মূসা আশআরি রসূলুল্লাহ্ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চার খলীফা থেকে এবং মুয়ায, ইবনে মাসউদ ও উব্বাই ইবনে কায়াব রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র মূসা, ইব্রাহীম, আবু বুরদা, আবু বকর এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে আবদুল্লাহ প্রমুখ।

আবু মূসা বিয়াল্লিশ হিজরিতে ষাটের কিছু অধিক বয়সে ওফাত লাভ করেন।

১১ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)

তিনি হলেন আমীরুল মুমিনীন আবু হাফস উমর ইবনুল খাত্তাব ইবনে নুফায়েল আল কারশি আল আদবি। মহা ফুজ্জার যুদ্ধের চার বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্র নবুয়্যাত লাভের ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহন করেন।

খলীফা নিজস্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উমর হস্তী যুদ্ধের তের বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। জাহেলি যুগে তাঁর উপর সাফারাতের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের উপর অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। অতপর ইসলাম গ্রহণ করেন আর তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো মুসলমানদের জন্যে একটা বিজয়।

তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে বলেছিলেন, যাও মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করো।' জবাবে আবদুল্লাহ্ বলেনঃ আমীরুল মুমিনীন আমাকে একাজ থেকে রেহাই দিতে পারেন না? আমীরুল মুমিনীন বললেন ঃ তুমি একাজকে অপসন্দ করছো অথচ তোমার পিতা বিচার ফায়সালা করেছেন?

ইবনুল আরবি বলেছেন ঃ উসমান যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেছেন, তোমার পিতা বিচার ফায়সালা করেছেন, এর অর্থ হযরত উমর রসূলুল্লাহর নিযুক্ত বিচারক ছিলেন।

১২ **উবাই ইবনে কা'আব (রা)**

ইনি ছিলেন সাহাবিগণের শ্রেষ্ঠ কারী। আকাবার দ্বিতীয় শপথে উপস্থিত ছিলেন। বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া রসূলুল্লাহর সাথে তিনি সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি সাহাবা বিচারকগণের অন্যতম ছিলেন।

১৩ **যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)**

ইনি হলেন যায়িদ ইবনে সাবিত আনসারি খাজরাজি। তিনি অহী লিখকদের অন্যতম ছিলেন। সর্বাধিক ফারায়েজ জানতেন। ইবনে সা'আদ তাঁকে সাহাবি মুফতিগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি মদীনায় বিচার ফায়সালা ও ফতোয়াদানের কাজে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

১৪ **আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)**

তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারী ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ(স) বলেছেনঃ

مَنْ سَرَّهُ انْ يَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ غَضًا كَمَا نَزَلَ فَلْيَقْرَأْ عَلٰـى قِرَاْةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ ۰ (الكتانى عن الطبرى)

যে ব্যক্তি কুরআনকে অবতীর্ণ যেভাবে হয়েছে সেরকম তরতাজা করে পড়তে চায়, সে যেনো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো তিলাওয়াত করে।

এই শেষোক্ত তিনজনকে মাসরূক রসূলুল্লাহ্র নিযুক্ত বিচারপতি গণের মধ্যে গন্য করেছেন। কাত্তানি একথা তাবারির সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

❖❖❖

৫. বিচারক হবার যোগ্যতা

আবু ইয়া'লি আল ফাররা বলেছেন ঃ "বিচারক পদে কেবল এমন ব্যক্তিকেই অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে, যিনি সাতটি শর্ত পূর্ণ করতে পারবেন। শর্তাবলী হলো ঃ

১. তাকে পুরুষ হতে হবে,
২. বালিগ হতে হবে,
৩. সুস্থ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে,
৪. স্বাধীন হতে হবে,
৫. মুসলিম এবং ন্যায়পরায়ণ হতে হবে,
৬. তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টি শক্তি অটুট থাকতে হবে এবং
৭. তাকে যথার্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে।"[১]

❒ পুরুষ হবার শর্তারোপ করা হয়েছে একারণে, যেহেতু মহিলারা শাসক ও সাক্ষ্য হবার ক্ষেত্রে অপূর্ণ।

ইবনে জরীর তাবারি বলেছেন ঃ মহিলারা ইসলামী শরীয়ার সকল বিষয়ে ফায়সালা প্রদান করার ও বিচারক হবার বৈধতা রাখে।

আল মাওরুদি বলেছেন ঃ "ইবনে জরীর তাবারীর এ মতটি তাঁর একার মত। অন্যদের ইজমা (মতৈক্য) তাঁর এ মতকে খন্ডন করে দিয়েছে। তাছাড়া তাঁর মত কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সাথেও সাংঘর্ষিক ঃ

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (النساء: ٣٣)

পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল। কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। [সূরা ৪ আননিসা ঃ ৩৩]

সুতরাং মহিলাদেরকে পুরুষদের উপর কর্তৃত্বশীল বানানো বৈধ হতে পারেনা।[২]

সহীহ বুখারিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেন ঃ

১.আবু ইয়ালি আল ফারা ঃ আহকামুস সুলতানিয়া, পৃঃ ৬০

২. আল মাওরুদি ঃ আহকামুস সুলতানিয়া পৃঃ ৬৫ ।

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّيْتَهُمْ امْرَأَةٌ – (بخارى)

ঐ জাতি সফল হতে পারেনা যাদের শাসক একজন নারী।

যারা মহিলাদের বিচারক হওয়াকে বৈধ মনে করেন তারা এ হাদীস সর্ম্পকে বলেছেন, এটি কেবল খিলাফতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এ হাদীস থেকে এতোটুকুই বুঝা যায় যে, মহিলারা কেবল ক্ষমতার শীর্ষে তথা রাষ্ট্র প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেনা। আবু হানীফা সেই সব বিষয়ে মহিলাদের রায় প্রদানকে বা বিচারক হওয়াকে বৈধ বলেছেন, যে সব বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ হুদুদ ও কিসাস ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তারা বিচার ফায়সালা করতে পারবে।

❐ বালিগ ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধির শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে, যেহেতু শিশু এবং পাগল নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। সুতরাং তাদের পক্ষে অন্যদের বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নই উঠেনা। তাছাড়া ঘটনাবলী ও সাক্ষী প্রমাণের বাস্তবতা উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

❐ স্বাধীন হবার শর্তারোপ করা হয়েছে এ কারণে, যেহেতু দাস শাসক হতে পারেনা। তাছাড়া তার সাক্ষ্যও পূর্ণাংগ বলে গণ্য করা হয়না। আল মাওরুদি বলেছেনঃ দাস তো নিজেই অপরের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সুতরাং তার পক্ষে বাদী বিবাদীর উপর নিয়ন্ত্রণারোপ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া তার সাক্ষ্যই গ্রহণ যোগ্য নয়। তার রায় তো কার্যকর হবার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পূর্ণ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ ব্যক্তি বিচারক হতে পারেনা। একই ভাবে পূর্ণ স্বাধীন নয় এমন ব্যক্তি ও বিচারক হতে পারেনা। একই ভাবে পূর্ণ মেয়াদ হয়নি এমন চুক্তিবদ্ধ দাসও বিচারক হতে পারেনা। আংশিক মুক্ত (একাধিক মনিবের সকলের নিকট থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি এমন) দাসও বিচারক হতে পারেনা।

তবে দাসত্বের শৃংখল ফতোয়া দান এবং হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।

অন্যান্য যোগ্যতা না থাকলে দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার সাথে সাথে যে কোনো ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ করা যেতে পারে। কেননা শাসক ও বিচারক পদে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়ের কোনো গুরুত্ব নেই।

আমিরুল মুমিনীন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু হুযাইফার মুক্ত করা দাস সালিম সর্ম্পকে বলেছিলেনঃ আজ যদি সালিম বেঁচে থাকতো, তবে আমি

তাকে খিলাফতের দায়িত্ব সঁপে যেতে ইতস্তত করতাম না। এ থেকেই প্রমাণ হলো যে মুক্ত দাসের খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া বৈধ।[৩]

❒ মুসলিম হবার শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে, যেহেতু কোনো ফাসিক মুসলিমকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা বৈধ নয়, সেক্ষেত্রে কোনো কাফিরকে মুসলমানদের কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করার তো প্রশ্নই উঠেনা।

আল মাওরুদি বলেছেন ঃ

যেহেতু সাক্ষী হবার ক্ষেত্রেই মুসলিম হওয়া শর্ত, সেহেতু বিচারক হবার জন্যে তো অবশ্যি মুসলিম হতে হবে। কারণ এ প্রসংগে আল্লাহর অকাট্য বাণী রয়েছেঃ

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (النساء : ١٤١)

"আল্লাহ কখনো মুমিনদের উপর কাফিরদের বিজয়ী করবেননা" [সূরা ৪ আননিসা ঃ ১৪১]

এজন্যে কোনো কাফিরকে না মুসলমানদের উপর আর না কাফিরদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করা যেতে পারে। আবু হানীফা বলেছেন, কাফিরকে তার নিজ ধর্মের লোকদের বিচারক নিয়োগ করা যেতে পারে।[৪]

❒ ন্যায় পরায়ণ হবার শর্ত আরোপ করা হয়েছে এ জন্যে, যেহেতু ফাসিকের দীনদারী ও বিশ্বস্ততার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়না। অথচ বিচারকের পদ একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ।

আল মাওরুদি বলেছেনঃ

সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্যেই 'ন্যায়পরায়ণতা একটি অপরিহার্য শর্ত। ন্যায় পরায়ণতা মানে সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দায়ীত্বশীলতা, নিষিদ্ধ ও গুণাহের কাজ থেকে বিরত থাকার তীব্র অনুভূতি। আর সমস্ত ক্রিয়া কর্ম ও আচার আচরণ সকল প্রকার সন্দেহের উর্ধ্বে থাকা, ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়া। সকল দীনি ও দুনিয়াবি কাজে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন এই সবগুলো গুণ বৈশিষ্টের সমাহার ঘটবে তখন তাকে বলা হবে 'ন্যায়পরায়ণ'। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

৩.আল মাওরুদি ঃ আদাবুল কাযা, ১ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা।
৪. আল মাওরুদিঃ আদাদুল কাযা ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং আহকামুস সুলতানিয়া ৬৫ পৃষ্ঠা।

তাকে শাসক ও বিচারক নিয়োগ করা যথার্থ হবে। এর মধ্যে কোনো একটি যোগ্যতা যদি তিনি হারিয়ে ফেলেন, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাকে শাসক বানানো যাবেনা। তার কথা শুনা হবেনা এবং তার নির্দেশ কার্যকর করা যাবেনা।[৫]

❒ সুস্থ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির শর্ত এজন্যে আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে তিনি মকদ্দমার পক্ষদ্বয় ও সাক্ষীদেরকে চিনতে ও জানতে পারেন। সাধারণত অন্ধ ও কানা লোকেরা এ যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত থাকেন। অন্যান্য অংগের অসুস্থতা বিচার ফায়সালার উপর প্রভাব ফেলেনা। তাই সেগুলো শর্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

আল মাওরুদী বলেছেনঃ

বিচারকের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সুস্থ থাকতে হবে, যাতে করে তিনি যথার্থভাবে অধিকারীর অধিকার নির্ণয় করতে পারেন। স্বীকৃতিদানকারী এবং অস্বীকারকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। সত্য মিথ্যার পরখ করতে পারেন। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি সাধারণত এসব যোগ্যতা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাই অন্ধকে এ দায়িত্বে নিয়োগ করা যেতে পারেনা। কিন্তু ইমাম মালিকের মতে অন্ধ ব্যক্তি বিচারক হতে পারেন এবং অন্ধের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। কানা ব্যক্তি বিচারক হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। অন্যান্য অংগ সুস্থ থাকা না থাকা বিচারক হবার জন্যে ধর্তব্য নয়, তবে রাষ্ট্র প্রধান হবার জন্যে সকল অংগের সুস্থতা অপরিহার্য। সুতরাং একজন পংগুকেও বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ পদে সর্বাংগীন সুস্থ ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত করাই উত্তম। যাতে করে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও বিচারকার্যে সাহায্য করে।[৬]

❒ বিচারক হবার জন্যে শরীয়ত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকা জরুরি। শরীয়ত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকার জন্যে চারটি বিষয়ের জ্ঞান অপরিহার্যঃ

এক ঃ কিতাবুল্লাহ বা আল কুরআনের জ্ঞান। বিশেষভাবে কুরআনে বর্ণিত শরীয়তের বিধি বিধান সমূহের জ্ঞান এবং বিধান সমূহের নাসিখ

---

৫. আল মাওরুদিঃ আহকামুস সুলতানিয়া।

৬. আল মাওরুদি ঃ আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা ৬৫ এবং আদাবুল কাযি ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৬১৮, ৬২৫।

মানসুখ, মুহকাম মুতাশাবিহ, আম খাস এবং মুজমাল, মুফাসসাল ও মুফাসসারের জ্ঞান।

দুই ঃ প্রমাণিত সুন্নতে রসূলের জ্ঞান। অর্থাৎ যেসব পন্থা ও পদ্ধতিতে তাঁর কর্ম ও বাণী পাওয়া যায়, সেগুলোর শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার জ্ঞান থাকা এবং যাচাই বাছাইর মাধ্যমে প্রমাণিত সুন্নাহ অবহিত থাকা।

তিন ঃ অতীত ইমামগণের মতামত জানা থাকা। কি কি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ইজমা (ঐকমত্য) ছিলো আর কি কি বিষয়ে মতপার্থক্য ছিলো সেগুলো জানা থাকা, যাতে করে ইজমার অনুসরণ করতে পারে। আর মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে নিজে একটি মত প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

চার ঃ কিয়াসের মূলনীতি ও বিধান সর্ম্পকে জ্ঞান রাখা, যাতে করে শরীয়ত প্রণেতা যেসব বিষয়ে স্পষ্ট বিধান প্রদান করেননি সেসব বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ ও অতীত ইমামদের ইজমার ভিত্তিতে ইজতিহাদ করতে পারে।

আলমাওরুদী বলেছেন ঃ

যখন কোনো ব্যক্তি শরয়ী বিধানের এই চারটি উৎস সম্পর্কে পান্ডিত্য অর্জন করবেন তখন তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন আলিম বলে গণ্য হবেন। দীনি বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ করতে পারবেন, ফতোয়া দিতে পারবেন এবং মামলা মকদ্দমার রায় দিতে পারবেন। তাছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিকট ফতোয়া ও ফায়সালার বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও মতবিনিময় করতে পারবেন। কারো মধ্যে যদি এইসবগুলো বা এর কোনো একটি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে, তবে তিনি মুজতাহিদ বলে গণ্য হবেন না। সুতরাং এমন ব্যক্তি মুফতি হতে পারেনা এবং তাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারেনা। এমন ব্যক্তিকে যদি বিচারক বানানো হয় তবে তার ফায়সালা শুদ্ধ হোক বা অশুদ্ধ তা বাতিল বলে গণ্য হবে। তার ফায়সালা সঠিক হলেও তা অকার্যকর থাকবে। আর তাঁর ভ্রান্ত ফায়সালার কারণে যা কিছু ক্ষতি হবে, সেজন্যে তার নিয়োগকর্তা দায়ী থাকবে।

অবশ্য আবু হানীফা বলেছেন, মুজতাহিদ নয় এমন ব্যক্তিকেও বিচারক বানানো যেতে পারে। তবে তার দায়িত্ব হলো তিনি আইন ও রায়ের বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে জেনে নেবেন। এটা আবু হানীফার একক মত। অধিকাংশ ফকীহ্র মত হলো, অমুজতাহিদ ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলে তার নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে আর তার

প্রদত্ত রায় ও জারিকৃত হুকুম রহিত হয়ে যাবে। তা কার্যকর করা যাবেনা। কারণ বিচারকের পদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ। সুতরাং এ পদে কেবল এমন ব্যক্তিকেই অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে, যিনি সত্য সম্পর্কে অবগত এবং সত্যাশ্রয়ী।[৭]

আবু হানীফার সাথিরা এমন ব্যক্তিকেও বিচারক পদে নিয়োগ করা বৈধ মনে করেন, যিনি শরীয়া বিশেষজ্ঞদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ফায়সালা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন।[৮]

ইবনে কুতাইবা নিজ সূত্রে উমর ইবনে আবদুল আযীযের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন ঃ

ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি বিচারক হতে পারেনা যতোক্ষণ না সে (নিম্নোক্ত) পাঁচটি যোগ্যতার অধিকারী হবে ঃ

১. আলিমে দীন তথা দীনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী,

২. আলিমদের সাথে পরামর্শকারী,

৩. পদলোভহীন ,

৪. শত্রুর প্রতিও সুবিচারক এবং

৫. উম্মাহর অতীত আলিমগণের ইজমার(ঐক্যমতের)অনুসারী।[৯]

---

৭. আল মাওরুদি ঃ আহকামুস সুলতানিয়া।

৮. আল মাবসূত ঃ ১৬শ খন্ড ৭২ পৃষ্ঠা এবং হাশীয়া ইবনে আবেদীন ৪র্থ খন্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা।

৯. ইবনে কুতাইবা ঃ উয়ূনুল আখবার ঃ ১ম খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা।

৬ বিচারকের পদ গ্রহণে আলিমগনের সতর্কতা

অতীতের আলিমগণ (রাহিমাহুমুল্লাহ) বিচারকের পদ গ্রহণ করতে চাইতেননা। এ পদ গ্রহণ করতে তাঁরা অস্বীকার করতেন। কারণ এ এক দায়িত্বপূর্ণ পদ। এ পদ গ্রহণের ব্যাপারে হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিচারকদেরকে কঠিন জবাবদিহী করতে হবে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো,

১. আবু বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْقَضَاةُ ثَلاَثَــةٌ - وَاحِدٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِيْ الـنَّارِ • وَاَمَّا الَّذِىْ فِيْ الـجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضى بِـه وَرَجُـلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِيْ النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلى جَهْلٍ فَهُوَ فِيْ النَّارِ (رواه ابوداؤد ، ترمذى، ابن ماجه)

বিচারক তিন প্রকার হয়ে থাকে। তন্মধ্যে একপ্রকারের বিচারকরা জান্নাতে যাবে আর দুই প্রকারের বিচারকরা যাবে জাহান্নামে। জান্নাতে যাবে ঐ বিচারক যে সত্যকে জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী সুবিচার করবে। পক্ষান্তরে যে সত্যকে জেনেও অবিচার করবে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞতা নিয়ে বিচার করবে সেও জাহান্নামে যাবে।[1]

২.আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلى الْقَاضِىْ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَنّى اَنَّه لَمْ يَقْضِ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ فِى تَمَرَةٍ قَطُّ • (مسند احمد ، ابن حبان)

---

১. আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

কিয়ামতের দিন সুবিচারকের সম্মুখেও এমন একটি মুহূর্ত আসবে যখন সে মনে মনে বলবে হায়! একটি খেঁজুরের বিষয়েও যদি আমি দুই ব্যক্তির মাঝে ফায়সালা না দিতাম।[২]

৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কোনো জায়গায় নিয়োগ করুন, যাতে আমি কোনোভাবে দিনাতিবাহিত করে যেতে পারি।' রসূলুল্লাহ বললেন ঃ

يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْيِيْهَا اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمْ نَفْسٌ تُمِيْتُهَا (ابوداؤد، ترمذى، ابن ماجه) .

হে হামযা! একজন ব্যক্তিকে জীবিত রাখা আপনি বেশি পছন্দ করেন, নাকি মেরে ফেলা? হামযা বললেন ঃ 'জীবিত রাখা।' রসূলুল্লাহ বললেনঃ "তবে আপনি নিজেকে রক্ষা করুন' (অথাৎ কোনো পদে অধিষ্ঠিত হবার লোভ করবেননা)।

৪. আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ اَوْجُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنَ . (ابوداؤد، ترمذى، ابن ماجه ، حاكم)

যাকে বিচারকের পদে নিয়োগ করা হলো কিংবা লোকেরা যাকে বিচারক মানলো, তাকে ছুরি ছাড়াই হত্যা করা হলো।[৩]

ইমাম শা'বি বলেছেন ঃ

বিচারকের পদ এক কঠিন পরিক্ষার পদ। এক কঠিন পরিশ্রমের পদ। যে এ পদ গ্রহণ করলো সে নিজেকে হত্যা করার জন্যে পেশ করলো। কারণ এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুস্কর। সুতরাং একালে এপদ থেকে দুরে থাকা কর্তব্য। সওয়াবের আশা থাকলেও এ পদের প্রার্থী হওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।[৪]

---

২. মুসনাদে আহমদ ও ইবনে হিব্বান।

৩. আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, হাকিম

৪. তারিখু কাযাতুল উন্দুলুস পৃষ্ঠা ১০।

আন নাবাহি বলেছেনঃ

> অতীতে, বহু বড় বড় আলিমকে বিচারকের পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হলে তাঁরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ঃ ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবার, মুস'আব ইবনে ইমরান, আবান ইবনে ঈসা ইবনে দীনার, কাসিম ইবনে সাবিত ইবনে আবদুল আযীয আল ফেহ্রি, আবু ঈসা আহমদ ইবনে আবদুল মালিক আশবিলি এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুস সালাম আল খাশানি প্রমুখ।[৫]

আবু কিলাবাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে ডাকা হলে তিনি ইরাক থেকে পালিয়ে সিরিয়া চলে যান। সিরিয়া এসে শুনতে পান এখানকার বিচারপতির মৃত্যু হয়েছে। এখবর জানার সাথে সাথে তিনি সেখান থেকে অবিলম্বে ইয়ামামা চলে যান।

বর্ণিত আছে, সুফিয়ান সওরিকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি বসরা অভিমুখে পলায়ন করেন এবং সেখানে আত্মগোপন করে থাকেন। এ অবস্থাতেই সেখানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁকে বেদম প্রহার করা হয়, কয়েদ করে রাখা হয় এবং তাঁর উপর নানা রকম নির্যাতন চালানো হয়, কিন্তু জীবন থাকতে তিনি (রাজতন্ত্রের অধীনে) বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে রাজি হননি।

এছাড়াও আরো অসংখ্য উলামায়ে কিরাম বিচারকের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সীরাত ও জীবনী গ্রন্থাবলীতে এরূপ বহু আলিমে দীনের জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন অনেক বড় বড় আলিমে দীন, ফকীহ্, মুহাদ্দিস এবং যাহিদ ও আবিদ। তাঁদেরকে নির্মমভাবে প্রহার করা হয়, গালাগাল করা হয়, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁরা সবর অবলম্বন করেন। কিন্তু বিচারকের পদ গ্রহণ করতে রাজি হননি।

অপরদিকে বাস্তব ব্যাপার হলো, খিলাফতের পর অর্থাৎ খলীফার পদমর্যাদার পরই বিচারপতির পদমর্যাদা । নবীগণও নিজ নিজ সময়ের বিচারক ছিলেন।

---

৫. তারিখু কাযাতুল উন্দুলুস পৃষ্ঠা ১২।

বহু সহীহ হাদীসে সত্যাশ্রয়ী ন্যায়পরায়ণ সুবিচারকদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যেসব বিচারক সুবিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কারো তিরস্কারের ভয় পায়না। এ প্রসংগে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা গেলো ঃ

১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِيْ اثْنَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِ بِهَا وَيَعْمَلُ بِهَا ٠

(بخاری مسلم)

দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ। একজন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা ধনমাল দিয়েছেন এবং তা হকপথে বিলিয়ে দেবারও তৌফিক দিয়েছেন। দ্বিতীয় হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করে এবং আমল করে।

২. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

هَلْ تَدْرُوْنَ مَا السَّابِقُوْنَ اِلٰى ظِلِّ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ٠ قَالَ الَّذِيْنَ اِذَا عَلِمُوا الْحَقَّ قَبِلُوْهُ وَاِذَا سُئِلُوا عَنْهُ بَذَلُوْهُ وَاِذَا حَكَمُوا الْمُسْلِمِيْنَ حَكَمُوا كَحُكْمِهِمْ لاِ نْفُسِهِمْ ٠

(مسند احمد)

তোমরা কি জানো কিয়ামতের দিন সবার আগে কারা আল্লাহর ছায়া তলে এসে পৌঁছাবে? সাহাবিরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, এরা তারা যারা সত্যকে উপলব্ধি করার সাথে সাথে গ্রহণ করে। সত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তা যথাযথভাবে প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের ফায়সালা করতে বলা হলে ঠিক সেরকম বিচার করে যেমনটি করে তারা নিজের জন্যে।

৩. হারিস ইবনে উসামা তাঁর মুসনাদে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَعَدْلُ الْعَامِلِ فِي رِعَيَّتِهِ يَوْمًا وَاحِدًا اَفْضَلُ مِّنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ فِيْ اَهْلِهِ مَائَةَ عَامٍ وَخَمْسِيْنَ عَامًا • (المطالب العالية)

কোনো কর্মকর্তার তার অধীনস্থ জনগণের মধ্যে একদিন সুবিচার করা আবিদ কর্তৃক নিজ ঘরে একশ বছর ইবাদত করার সমতুল্য। বর্ণনাকারী সন্দেহ করেছেন তিনি একশ বছর শুনেছেন নাকি পঞ্চাশ বছর। [৬]

৪. অপর একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّه اِمَامٌ عَادِلٌ.....

যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবেনা সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে স্থান দেবেন। তারা হলেন (এক) সুবিচারক ন্যায়পরায়ণ নেতা ......।

এখানে প্রথমেই সুবিচারক নেতা বা শাসকের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও আরো কিছু হাদীস আছে যেগুলোতে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে এবং ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

উলামায়ে কিরাম উভয় প্রকার হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাঁরা বলেছেন যারা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্যে প্রার্থী হবে অথচ সুবিচার করতে তারা অক্ষম হাদীসে তাদের সতর্ক করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যাদেরকে প্রার্থী হওয়া ছাড়াই এ পদে নিয়োগ করা হবে, তারা যদি আল্লাহর ভয় ও আল্লাহ্র পুরস্কারের আশা নিয়ে সুবিচারের দায়িত্ব পালন করে, হাদীসে তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

---

৬. আল মুতালিবুল আলিয়া, ২য় খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা।

৭. ইসলামে মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার*

মহান আল্লাহ বলেনঃ

'আমানত তার যথার্থ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দিতে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন সুবিচার করবে।' [সূরা নিসাঃ ৫৮]

'কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর।' [সূরা মায়েদাঃ ৮]

এই দুটি আয়াত যদিও ব্যাপক অর্থে মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সুবিচার করার জন্য বাধ্য করে, কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে ইসলামী রাষ্ট্রও মুক্ত থাকতে পারেনা। ইসলামী রাষ্ট্রকেও অবশ্যি ন্যায়বিচার ও সুবিচারের অনুসারী হওয়া উচিৎ,, বরং তাকেই সুবিচারের সর্বোত্তম অনুসারী হতে হবে। কারণ, মানুষের মধ্যেতো সর্বাধিক শক্তিশালী বিচারক সংস্থা হচ্ছে রাষ্ট্র। তাই তার আইনে বা ফায়সালায় যদি সুবিচার বিদ্যমান না থাকে, তবে সমাজের অন্য কোথাও সুবিচার পাওয়ার আশা করা যায়না।

এখন দেখা যাক, রাষ্ট্রের জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসল্লামের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ থেকে মানুষের মাঝে সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কি পন্থা ও মূলনীতি পাওয়া যায় ?

---

* এই অংশটি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)- এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে নেয়া হয়েছে।

১. বিদায় হজ্জের সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিলো এই যে ঃ

'নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন, তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত সেরূপ সম্মানিত, যেরূপ সম্মানিত তোমাদের আজকের এই হজ্জের দিনটি।'

এই ঘোষণায় ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যে রাষ্ট্রই নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করবে তাকেই এসব দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। *

২. এ মর্যাদা কোন্ অবস্থায় এবং কিভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে? তাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাক্য বলে দিয়েছেন।

' অতএব লোকেরা যখন একাজ [তাওহীদের সাক্ষ্য, রিসালাতের সাক্ষ্য, নামায কায়েম. যাকাত প্রদান] করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জীবন রক্ষা করে নিলো। কিন্তু ইসলামের কোনো অধিকারের ভিত্তিতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা এবং তাদের নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের হিসাব গ্রহণ আল্লাহ্‌র যিম্মায়।' [বুখারী ও মুসলিম]

'অতএব তাদের জানমাল [তাতে হস্তক্ষেপ] আমার জন্য হারাম। কিন্তু জান ও মালের কোনো অধিকার তাদের উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের গোপন বিষয়ের হিসেব আল্লাহ্‌র যিম্মায়।' [বুখারী ও মুসলিম]

'অতএব যে ব্যক্তি এর [কলেমা তাওহীদের] প্রবক্তা হলো সে আমার থেকে তার মাল ও জান বাঁচিয়ে নিলো। তবে আল্লাহ্‌র কোনো অধিকার [কোনো অপরাধের কারণে] তার উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তার গোপন বিষয়ের হিসেবে আল্লাহ্‌র যিম্মায়।' [বুখারী]

---

* উপরোক্ত হাদীসে যদিও মুসলমানদের অধিকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শরীয়াতের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এইযে. যে অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে বসবাস গ্রহণ করে সে ইসলামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার লাভ করে।

উল্লেখিত হাদীস সমুহ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নাগরিক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তার উপর [অথবা তার বিরুদ্ধে] কোনো অধিকার প্রমাণিত না হয় অর্থাৎ সে কোনো ব্যাপারে আইনত দোষী সাব্যস্ত না হয়, ততক্ষণ তার উপর হস্তক্ষেপ করা যাবেনা।

৩. কোনো নাগরিকের উপর [অথ্যাৎ তার বিরুদ্ধে] কিভাবে অধিকার প্রমাণিত হয়? মহনবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

'বাদী ও বিবাদী যখন তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনেছো সেভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ফায়সালা প্রদান করবেনা।' [আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মদ]

হযরত ওমর ফারুক [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে বলেনঃ
'ইসলামে ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতিত কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যায়না।' [মুয়াত্তা ইমাম মালিক]

আলোচ্য মোকদ্দমার যে বিবরণ উক্ত মুয়াত্তা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, ইরাকের নব বিজিত এলাকায় মিথ্যা অভিযোগে লোকদের আটক করা হতে থাকলে এবং তার বিরুদ্ধে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দরবারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তদপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত কথা বলেন। এ বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এখানে 'ন্যায়সংগত পন্থা' অর্থ যথাযথ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম [Due process of Law] অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করতে হবে এবং অপরাধীকে নিজের নির্দোষিতার পক্ষে বক্তব্য রাখার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যায়না।

৪. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহুর খিলাফতকালে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হলে, যারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলোনা। তিনি তাদের লিখে পাঠনঃ

'তোমরা যথায় ইচ্ছা বসবাস করো। আমাদের ও তোমাদের মাঝে শর্ত এইযে, তোমরা খুনখারাবি করবেনা, রাহাজানি করবেনা এবং কারো

উপর যুলুম করবেনা। তোমরা উপরোক্ত কোনো কাজে লিপ্ত হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।' [নায়লুল আওতার]

অর্থাৎ তোমরা যে মত ইচ্ছা পোষণ করতে পারো। তোমাদের মতামত ও উদ্দেশ্যের জন্যে তোমাদের আটক করা হবেনা। অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রশাসন যন্ত্র জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করো তবে অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকেনা যে, ন্যায় ইনসাফের ইসলামী নীতি কোনো অবস্থায়ই প্রশাসন বিভাগকে প্রচলিত বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ব্যতীত যথেচ্ছভাবে যাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করার, যাকে ইচ্ছা কয়েদ করার, যাকে ইচ্ছা নির্বাসন দেয়ার, ইচ্ছামতো কারো বাকশক্তি রুদ্ধ করার এবং যাকে ইচ্ছা মতামত প্রকাশের মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার প্রদান করেনা। রাষ্ট্র সমুহ সাধারণভাবে এ ধরনের যেসব এখতিয়ার তার প্রশাসন বিভাগকে দান করে তা ইসলামী রাষ্ট্র কখনো দান করতে পারেনা।

উপরন্তু মানুষের মাঝে মীমাংসা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফের অনুসরণের আরেক অর্থ যা আমরা ইসলামের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য থেকে জানতে পারি, তা এইযে, ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান, গভর্ণর, পদস্থ কর্মকর্তা ও সর্বসাধারণ সকলের জন্য একই আইন এবং একই বিচার ব্যবস্থা। কারো জন্য কোনো আইনগত স্বাতন্ত্র্য নাই, কারো জন্য বিশেষ আদালত নাই এবং কেউই আইনের হস্তক্ষেপ থেকে ব্যতিক্রম নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে নিজেকে এভাবে পেশ করেন, আমার বিরুদ্ধে কারো কোনো দাবি থাকলে সে যেনো তা আদায় করে নেয়। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু জাবালা ইবনে আইহাম সাসানী নামক গভর্ণরের উপর এক বেদুইনের কিসাসের দাবি পূরণ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্ণরের জন্য আইনগত নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জনসাধারণকে গভর্ণরদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রকাশ্য আদালতে উত্থাপনের অধিকার প্রদান করেন।

৮. ইসলামে পারিবারিক সালিশী *

মহান আল্লাহ বলেনঃ

'আর যদি কোথাও তোমাদের স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক বিগড়ে যাবার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে পুরুষের আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজন সালিশ নির্ধারিত করে দাও। তারা দু'জন সংশোধন করে নিতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা ও মিলমিশের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।' [সূরা আন নিসাঃ ৩৫]

এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌছাবার বা ব্যাপারটি আদালত পর্যন্ত গড়াবার আগে ঘরেই তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। এ জন্যে এ পদ্ধতি বাতলানো হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সামাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। এই সালিশ কে নিযুক্ত করবে? এ প্রশ্নটি আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন। এর কারণ হচ্ছে, স্বামী- স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। তারাই তাদের বিরোধ নিস্পত্তি করবে। আবার উভয়ের পবিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরণের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। আর ব্যাপারটি যদি আদালতে চলে যায়, তাহলে আদালত নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত দেবার আগে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে এর মীমাংসা করে দিতে পারে।

---

* এ অংশটিও মাওলানা মওদূদী (র) -এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে নেয়া হয়েছে।

সালিশদের ক্ষমতার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এই সালিশে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও মীমাংসা চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। তবে তাদের মতে ঝগড়া মিটমাট করার যে সংগত ও সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে সেজন্য তারা সুপারিশ করতে পারে। এই সুপারিশ মেনে নেয়া না নেয়ার ইখতিয়ার স্বামী-স্ত্রীর আছে। তবে স্বামী- স্ত্রী যদি তাদেরকে তালাক বা খুলা তালাক অথবা অন্য কোণ ব্যাপারে মীমাংসা করে দেবার জন্য দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করে থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যি তাদের ফায়সালা মেনে নেয়া স্বামী- স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণ এই মত পোষণ করেন। অন্য কিছু লোকের মতে, উভয় সালিশের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত দেবার এবং ঝগড়া মিটমাট করে আবার একসাথে মিলেমিশে চলার ফায়সালা করার ইখতিয়ার আছে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার অধিকার তাদের নেই। হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ এই মত পোষণ করেন। তৃতীয় একটি দলের মতে এই সালিশদ্বয় স্বামী-স্ত্রীকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবইর, ইবরাহীম নাখঈ, শা'বী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এবং অন্যান্য ফকীহগণ এই মতের প্রবক্তা।

হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলীর (রা) ফায়সালার যেসব নজীর আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায়, তারা উভয়েই সালিশ নিযুক্ত করার সাথে সাথেই আদালতের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিজেদের ফয়সালা কার্যকর করার প্রশাসনিক ক্ষমতা দান করতেন। তাই হযরত আকীল ইবনে আবু তালেব এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআর মামলা যখন হযরত উসমানের আদালতে দায়ের করা হলো, তখন তিনি স্বামীর পরিবার থেকে হযরত ইবনে আব্বাসকে এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে হযরত মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ানকে সালিশ নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা দু'জন যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাদের স্বামী- স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে তাহলে তা করে দেবেন। অনুরূপভাবে একটি মামলায় হযরত আলী সালিশ নিযুক্ত করেন। তাদেরকে মিলিয়ে দেবার বা আলাদা করে দেবার ইখতিয়ার দান করেন। এ থেকে জানা যায়, সালিশের নিজস্ব কোন আদালতী ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। তবে তাদের নিযুক্তির সময় আদালত যদি তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের ফায়সালা আদালতের ফায়সালার ন্যায় প্রবর্তিত হবে।

———o———

আবদুস শহীদ নাসিম-এর নিম্নোক্ত বইগুলো আপনার জ্ঞানরাজ্যকে প্রসারিত করবে

০১. ইসলামের পারিবারিক জীবন
০২. শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
০৩. ঈমানের পরিচয়
০৪. আল কুরআনের দু'আ
০৫. সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী
০৬. নবীদের সংগ্রামী জীবন
০৭. আল কুরআন আত তাফসীর
০৮. হাদীসে রাসূলে তাওহীদ রিসালাত আখিরাত
০৯. সবার আগে নিজেকে গড়ো
১০. কুরআন পড়ো জীবন গড়ো
১১. হাদীস পড়ো জীবন গড়ো
১২. এসো জানি নবীর বাণী
১৩. ইসলামী আন্দোলন ঃ সবরের পথ
১৪. শাহাদাত ঃ অনির্বাণ জীবন
১৫. ঈদুল ফিতর ঈদুল আযহা
১৬. বিপ্লব হে বিপ্লব
১৭. যাকাত সাওম ই'তেকাফ
১৮. উঠো সবে ফুটে ফুল